কৃতী বিজ্ঞানী

মেঘনাদ সাহা



মণি বাগচি

ভারতের বিজ্ঞানসাধক (৫)

কৃতীবিজ্ঞানী

মেঘনাদ সাহা

মণি বাগচি

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
রবীন বল
৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ১৯৮৭

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুদ্রাকর ঃ
রামকৃষ্ণ সারদা প্রিন্টার্স
শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল
৩৪, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা

*

যাকে বলে নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো সেই রকম মানুষ যে কোন দেশেই তুর্লভ। ভারতে এমন মানুষ আরো তুর্লভ। যে বালকটি ছিল ভারতের এক দূরান্ত গ্রামে এক অতি দরিদ্র পিতামাতার সন্তান, সেই বালকটি যে আপন প্রতিভার ছাড়পত্র নিয়ে ঢাকা শহরে এসে কয়েক বছর পরে পূর্ববঙ্গ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করবে—এমন কাহিনী অবিশ্বাস্য। কিন্তু অধ্যাপক সাহা প্রমাণ করেছিলেন যে এমন ঘটনা সত্যি হতে পারে। ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসে একজন সহপাঠী হিসাবে যখন তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল, তখন তাঁকে আমার মনে হয়েছিল একটি খাঁটি হীরে। তাঁর কাছে কোন কাজই কঠিন ছিল না, কোন তুঃখ স্বীকার অসহনীয় ছিল না এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন কঠিন বাধাই ছিল না তুরতিক্রমণীয়। একবার যে কাজ করবেন ঠিক করেন সেটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তিনি প্রতিনিবৃত্ত হতেন না।

গণিতের ছাত্র হিসাবেই তাঁর কলেজ জীবন শুরু হয়েছিল, পরে তাঁর অনুরাগ গিয়ে পড়েছিল পদার্থবিজ্ঞানের ওপর এবং একজন তত্ত্বীয় পদার্থবিদ হিসাবে অধ্যাপক সাহা আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি—অধ্যাপক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অতুলনীয়। সকলের ওপর তিনি ছিলেন একজন কর্মিষ্ঠ মানুষ। তাঁর সৃজনী প্রতিভার তিনটি কীর্তিস্তম্ভ—সাহা ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার রিসার্চ, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স এবং সায়েন্স য়্যাণ্ড কালচার—এই মহানগরীতেই বিদ্যমান রয়েছে।

—জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ



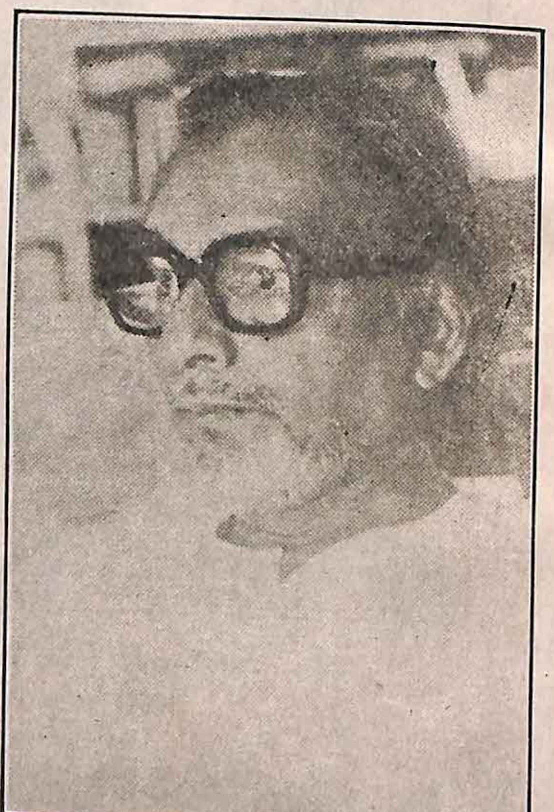
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার একটি বিরল আলোকচিত্র



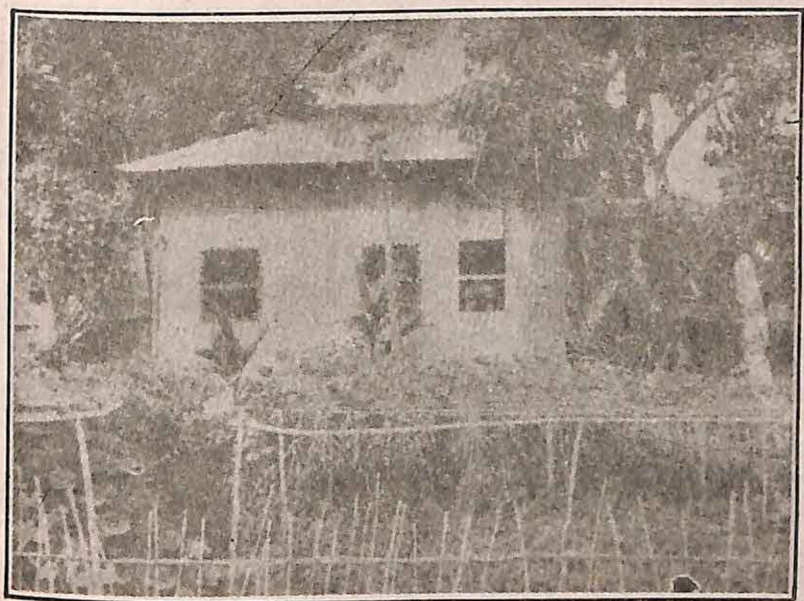
বাবা : জগন্নাথ সাহা



মা : ভুবনেশ্বরী



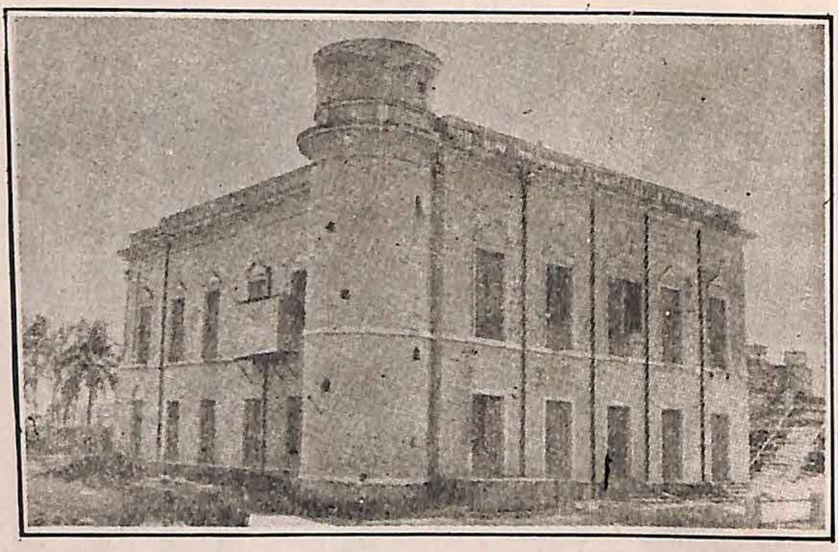
ডঃ মেঘনাদ সাহার
জেষ্ঠ্য পুত্র
ডঃ অজিতকুমার সাহা



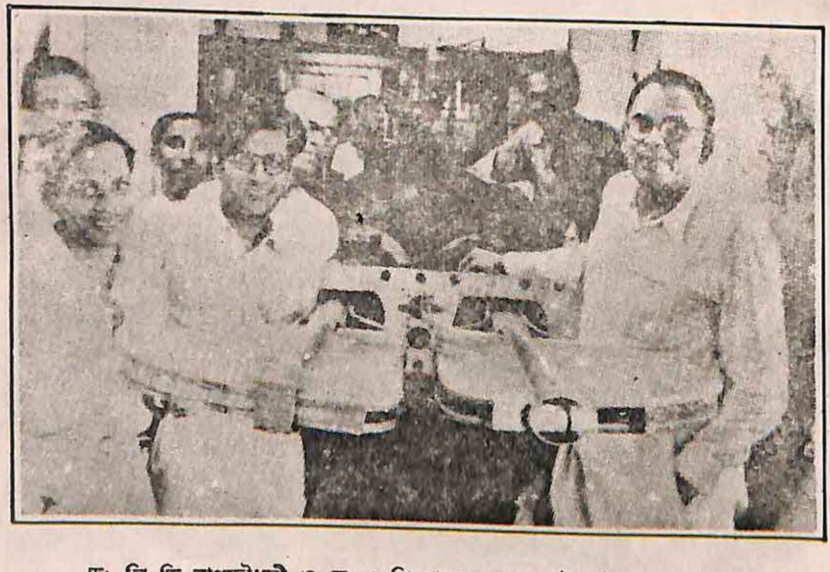
মেঘনাদ সাহার জন্মস্থান : শ্যাওড়াতলী গ্রামের বাড়ির বর্তমান ছবি



সিমুলিয়া মিড্‌ল স্কুল



সিমুলিয়া মিড্‌ল স্কুলের পর মেঘনাদ সাহা ভর্তি হন কিশোরীলাল জুবিলী স্কুলে



ডঃ বি ডি নাগচৌধুরী ও ডঃ এ পি পাত্রের সঙ্গে সাইক্লোট্রন লেবরেটরীতে
(ডান দিকে)

॥ এক ॥

তখন সবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে।

সেই সময়ে পৃথিবীর মানুষ একজন মহাবিজ্ঞানী সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। তাঁর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। জার্মানির বাইরে এই নামটি তখন খুব কম লোকেই শুনেছিল। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণিক ক্ষেত্র দ্বারা নক্ষত্রের আলোর বিপথে বা এক পার্শ্বে গমন সম্পর্কে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা দুটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে প্রমাণিত হয়েছিল। এই অভিযানের একটি পরিচালিত হয়েছিল ব্রিটিশ জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন দ্বারা আর অপরটি পরিচালনা করেন রাজকীয় গ্রহবিজ্ঞানী। এই চমকপ্রদ সংবাদ বহন করে কলকাতায় এলো একটি তারবার্তা। 'আইনস্টাইনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রমাণিত হয়েছে'—শুধু এইটুকু উল্লিখিত ছিল সেই তারবার্তাটিতে।

কে আইনস্টাইন ? কি সম্পর্কে ছিল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী ?

কলকাতার দৈনিক সংবাদপত্রগুলির অফিসে এবিষয়ে কারো কিছুই জানা ছিল না। সংবাদটা তো এমনি ছাপলে চলবে না—

পাঠকদের পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকার ইংরেজ সম্পাদক একজন প্রবীণ রিপোর্টারকে ডেকে বললেন: 'Try to find out somebody who can give a good account of it' ('যিনি এই বিষয়ে কোন সঠিক বিবরণ দিতে পারেন এমন কাউকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করুন।') তখন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ছিল একটা মানমন্দির (Observatory); রিপোর্টার ভাবলেন সেইখানে গেলে হয়ত এই বিষয়ে কিছু তথ্য জানা যেতে পারে! তিনি সোজা চলে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। দৈবক্রমে সেইখানে তিনি এক তরুণ অধ্যাপকের সাক্ষাৎ পেলেন। রিপোর্টারের মুখে সব কথা শুনে তিনি নিজে থেকেই আইনস্টাইনের আবিষ্কার ও তার পটভূমি সম্পর্কে একটা বিবরণ লিখে দিতে সম্মত হলেন। সেইখানেই তিনি বিবরণটি লিখে রিপোর্টারের হাতে দিয়ে দিলেন। পরের দিন 'স্টেটসম্যান' কাগজে বিবরণটি প্রকাশিত হলো। ভারতবর্ষে আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব সম্পর্কে—যে তত্ত্ব ১৯০৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল—সেই প্রথম বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হলো। তখনো পর্যন্ত য়ুরোপের মুষ্টিমেয় পদার্থ বিজ্ঞানী ও গণিতবিজ্ঞানী ছাড়া এ সম্পর্কে কারো কিছুই জানা ছিল না! বৈজ্ঞানিক অভিযানের ফলে তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ যখন প্রমাণিত হলো তখনি আইনস্টাইন পৃথিবীতে সুপরিচিত হয়ে উঠেন।

যে তরুণ অধ্যাপকটি আইনস্টাইনের আবিষ্কার সম্পর্কে সেই বিবরণটি লিখেছিলেন তিনিই বিশ্রুতকীর্তি পরমাণুবিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

১৮৯৩, ৬ অক্টোবর।

ঢাকা জেলার শেওড়াতালি গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে মেঘনাদ

সাহার জন্ম হয়। বাংলার অনেক কৃতী সন্তান ঢাকা জেলায় জন্ম গ্রহণ করেছেন। ভারতবর্ষকে যিনি পৃথিবীর বিজ্ঞান মানচিত্রে স্থাপন করেছিলেন সেই বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু এই জেলারই সন্তান ছিলেন। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ আইনজীবী ও সর্বস্বত্যাগী নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসও এই জেলার সন্তান ছিলেন। মেঘনাদ তাঁর পিতামাতার পঞ্চম সন্তান ছিলেন।

শেওড়াতালি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এখানকার অধিবাসীদের গ্রামের লোকেরা মোটামুটি লেখাপড়া জানত ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিল।

প্রায় সকলেই ব্যবসায়ী ছিলেন। মেঘনাদের পিতা জগন্নাথ সাহাও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ভুবনেশ্বরী ছিলেন মেঘনাদের মা। পিতামাতা দুজনেই কঠিন পরিশ্রম করতে পারতেন। উত্তরাধিকার সূত্রে মেঘনাদ তাঁর মা ও বাবার কাছ থেকে এই গুণটি ষোল আনার ওপর আঠার আনা লাভ করেছিলেন। ভুবনেশ্বরী ছিলেন কর্মনিপুণা ও ধৈর্যশীলা রমণী। স্বামীর সঙ্গে সমানভাবে পরিশ্রম করে তিনি সন্তানদের মানুষ করেন। তিনি সবসুদ্ধ পাঁচটি পুত্র ও তিনটি কন্যার জননী ছিলেন।

জগন্নাথের ছিল একটি মুদী দোকান। এই দোকান থেকে যা আয় হতো তাতেই তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে যেত। যদিও বিলাসিতা বা প্রাচুর্য ছিল না, তবু এই পরিবারটি ভুবনেশ্বরী দেবীর সংসার পরিচালনার গুণে কখনো অভাবের তাড়না বোধ করেনি কোন দিন। ব্যবসার সঙ্গে শেওড়াতালি গ্রামের অনেকেই সুদি কারবার করত ; কেউ কেউ ক্ষেত খামারও করত। জগন্নাথ কিন্তু সুদি কারবার করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। কেউ কেউ তাঁকে বলত, জগন্নাথ, দোকান বেচা-কেনা করে কয় পয়সা পাও; সুদি কারবার কর, পয়সার মুখ দেখতে পাবে।

বাড়িতে এসে স্ত্রীকে তিনি এই কথা বলেন আর জিজ্ঞাসা

করেন, তুমি কি বলো? ভুবনেশ্বরী স্বামীকে বলেছিলেন—ঐ ব্যবসা তুমি কখনো করবে না। সুদ খাওয়া পাপ। লোকে যখন তোমার ছেলেমেয়েদের বলবে, তোরা সুদখোরের ছেলে, তখন লজ্জায় তাদের মাথা কাটা যাবে।

জগন্নাথের বড় ছেলে জয়নাথ। মেঘনাদ তাঁর অগ্রজের চেয়ে তেরো বছরের ছোট ছিলেন। বড় ছেলেকে জগন্নাথ অনেক আশা করে ইংরেজি শিখিয়েছিলেন। কিন্তু রোজগারের দিক দিয়ে আশানুযায়ী ফল লাভ হলো না দেখে, জগন্নাথ তাঁর স্ত্রীকে একদিন বললেন, মেঘনাদকে বেশি পড়াব না।

—কেন?

—ওর দাদাকে তো অনেক আশা নিয়ে ইংরেজী পড়ালাম, একটা পাশও করল। কিন্তু কয়টা পয়সা ঘরে আনে জয়নাথ?

—তোমার একটু ধৈর্য কম। পয়সা আনার সময় কি ওর গেছে?

—আর কবে আনবে?

বড় ছেলের অকৃতকার্যতা দেখে জগন্নাথ ঠিক করলেন বর্ণ পরিচয়টা হলেই তিনি মেঘনাদকে দোকানের কাজে বসিয়ে দেবেন। তাঁর এই ছেলেটি যে মেধাবী পিতা তা বুঝতেন তবু সংসারের হালচাল দেখে আর ইংরেজী লেখাপড়ার ফল দেখে জগন্নাথ মনে মনে ঠিক করলেন মেঘনাদকে তিনি দোকানের কাজে বসিয়ে দেবেন। তখন তার বয়স পাঁচ বছর চলছে। পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় সবে শেষ করেছেন। বালক মনে মনে আশা করে আছে এবার তাকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে।

কিন্তু স্কুলের বদলে মেঘনাদকে বসতে হলো বাবার মুদীখানার দোকানে। দিন কতক পরে জগন্নাথ বুঝলেন, একে দিয়ে দোকানের কাজ চলবে না। তখন ভুবনেশ্বরী দেবীর পরামর্শক্রমে ছেলেকে তিনি স্কুলে পড়াবেন ঠিক করলেন। তাঁদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে

শিমুলিয়া বলে একটা বড় গ্রাম ছিল। এখানে একটা মধ্য ইংরেজী স্কুল ছিল। জগন্নাথ এইখানেই মেঘনাদকে ভর্তি করে দিলেন। জয়নাথ তাঁর এই ভাইটির লেখাপড়ায় খুব যত্ন নিতেন। তিনি চেষ্টা করে শিমুলিয়ার ডাক্তার অনন্তকুমার দাসের বাড়িতে বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন! অধ্যাপক সাহা তাঁর এই উপকারী ব্যক্তিকে কোনদিন বিস্মৃত হন নি। যিনি একদিন তাঁর জন্মভূমিকে বিজ্ঞান, শিক্ষা ও জাতিগঠনমূলক নানাবিধ কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সেই মেঘনাদ সাহার ছাত্রজীবন এইভাবে পূর্ব ভারতের এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামে আরম্ভ হয়েছিল।

তাঁর স্কুল জীবনের কথা বলতে গিয়ে অধ্যাপক সাহা নিজেই লিখেছেন: 'শিমুলিয়া স্কুলে আমার অঙ্কের মাস্টার যিনি ছিলেন সেই প্রসন্নকুমার চক্রবর্তীকে আমি চিরকাল মনে রেখেছি, কারণ ইনি আমার লেখাপড়ায় বিশেষ যত্ন নিতেন। তিনি ছাত্রদের সব সময় একটি উপদেশ দিয়ে বলতেন: 'পড়ো, জানতে পারবে'। তাঁর এই ছোট্ট উপদেশটি সেই বয়সে আমার হৃদয়ে যেন গেঁথে গিয়েছিল। বড়ো হয়ে আমি যখন Smiles-এর লেখা self-help বইটি পড়ি তখন সেই বইতেও মাস্টার মশাইয়ের এই উপদেশটি পেয়েছিলাম। মাস্টার মশাই আমাকে গণিতে বিশেষভাবে আগ্রহী করে তুলেছিলেন। গণিতে মাথা পরিষ্কার হয়, বুদ্ধি খোলে—এই কথা তিনি তাঁর সকল ছাত্রকেই বলতেন। তাঁর এই কথাটাও আমার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল ঐ বয়সে।'

১৯০৫।

মধ্য ইংরেজি স্কুলে পড়া শেষ হলো। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম

হয়ে ঢাকা জেলার মধ্যে মেঘনাদ স্কলারশিপ পেলেন। এক বছর প্রতিমাসে দশ টাকা করে পাবেন। জয়নাথ তখন বাবাকে বললেন, মেঘনাদকে এবার বড় স্কুলে ভর্তি করতে হবে। —সে তো ঢাকায় ; সেখানে থাকার খরচ, খাওয়ার খরচ কে যোগাবে? বললেন জগন্নাথ। —আপনাকে সেজন্য চিন্তা করতে হবে না, এই বলে বাবাকে আশ্বস্ত করেন জয়নাথ। তারপর একদিন ভাইটিকে সঙ্গে করে ঢাকা এলেন ও যথাসময়ে এখানকার কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এখানে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন নিখিলরঞ্জন সেন ও সুরেন্দ্রকুমার রায়। এরা দুজনেই পরবর্তীকালে যথাক্রমে বিজ্ঞান কলেজে ব্যবহারিক গণিতে ঘোষ অধ্যাপক ও যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সুপারিনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উনিশ শো পাঁচ সালটি বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন তথা রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে। লর্ড কার্জনের বিধানে এক বাংলা তখন ভেঙে দু'টুকরা হয়েছিল। পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা। কার্জনী বিধানের বিরুদ্ধে সেদিন সারা বাংলায় যে বিরাট আন্দোলন হয়েছিল, ইতিহাসে তারই নাম স্বদেশী আন্দোলন। এই আন্দোলনে স্কুল-কলেজের ছাত্ররাও যোগদান করেছিল নেতাদের নির্দেশে। পূর্ব-বাংলার ছোটলাট তখন ব্যাসফিল্ড ফুলার। একদিন তিনি কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করতে এলেন। স্কুলের ছাত্ররা সেদিন স্কুল বয়কট করলো। তাদের মধ্যে মেঘনাদও ছিলেন। সরকার ক্রুদ্ধ হয়ে বয়কটে যোগদানকারী ছাত্রদের ওপর চরম প্রতিশোধ নিলেন। তাদের সকলকে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা হলো ; মেঘনাদের ক্ষেত্রে তিনি শুধু বিতাড়িত হলেন না, তাঁর স্কলারশিপ বন্ধ হলো ও বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ থেকেও তিনি বঞ্চিত হলেন। অনেক ছাত্র ক্ষমা চেয়ে স্কুলে ফিরে এসেছিল, কিন্তু মেঘনাদ ও তার সহপাঠীদের কেউই ক্ষমা চাইলেন না।

সাময়িক উত্তেজনার মুখে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ কলেজিয়েট স্কুল থেকে বিতাড়িত হলেন। তখন তাঁর অগ্রজ জয়নাথ রাশ টেনে ধরলেন এবং ভাই যাতে আন্দোলনের আবর্তের মধ্যে গিয়ে না পড়ে সেজন্য তিনি তাঁকে ঢাকার একটি বিখ্যাত বেসরকারী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। সেই স্কুলটির নাম কিশোরীলাল জুবিলি স্কুল। এইখানে তিনি স্টাইপেণ্ড পেলেন আবার বিনা বেতনে পড়বার সুযোগও পেলেন। পড়ার বাকী খরচ তাঁর দাদা বহন করেন। জুবিলি স্কুলে মেঘনাদ চার বছর পড়েছিলেন এবং নিজ প্রতিভাগুণে তিনি শিক্ষকদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

জুবিলি স্কুলে পড়বার সময়ে তিনি স্থানীয় ব্যাপটিস্ট মিশন পরিচালিত বাইবেল ক্লাসে যোগদান করেছিলেন। বাইবেল পাঠে তাঁর আগ্রহ দেখে মিশনারী শিক্ষকরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। নিখিল বঙ্গ বাইবেল প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় মেঘনাদ প্রথম হয়ে নগদ একশত টাকা ও একটি সুন্দর বাঁধানো বাইবেল উপহার পেয়েছিলেন। জুবিলি স্কুলে যে কয়জন শিক্ষক তাঁর চরিত্র গঠনে সহায়তা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ইনি গণিতের শিক্ষক ছিলেন), পণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন এবং মথুরামোহন চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'প্রবোধবাবুই আমার মনকে বিজ্ঞানমুখী করে তুলেছিলেন। ইনি পরে বেথুন কলেজে যোগদান করেন।'

১৯০৯। মেঘনাদের ছাত্রজীবনের একটি স্মরণীয় বছর।

ঐ বছরে তিনি বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা[১] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। পূর্ববাংলার সমস্ত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মেঘনাদ প্রথম স্থান

১। তখন এই পরীক্ষার নাম ছিল এনট্রান্স পরীক্ষা এবং ১৯১০ সাল থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর নাম বদলিয়ে দেন ও তখন থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা চালু হয়।

লাভ করেন এবং চারটি বিষয়ে—অঙ্ক, ইংরেজি, বাংলা ও সংস্কৃত—সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। অঙ্কে পেয়েছিলেন ফুল মার্কস অর্থাৎ একশোর মধ্যে একশো। এই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে একটি স্কলারশিপ দেওয়া হয়। এই স্কলারশিপের পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা। এক বছর তিনি এই টাকা পেয়েছিলেন। পরীক্ষায় মেঘনাদের এই অসাধারণ কৃতিত্বে সেদিন সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন তুজন—তাঁর অগ্রজ জয়নাথ আর শিমুলিয়া গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক সেই প্রসন্নকুমার চক্রবর্তী।

কত কষ্ট করে লেখাপড়া শেখা সার্থক হলো।

জগন্নাথ ও ভুবনেশ্বরী তুজনেই প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন তাঁদের এই কৃতী পুত্রকে। শেওড়াতালি গ্রামে মেঘনাদের পাশের খবর যখন এসে পৌঁছল তখন গ্রামবাসীদের মধ্যেও যেন আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। মেঘনাদকে তাঁর লেখাপড়ায় মনোযোগের জন্য গ্রামের সবাই ভালবাসত। গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তি এসে জগন্নাথকে অভিনন্দিত করে বলেন, 'সাহা মশাই, মেঘা আপনার শুধু পুত্র নয়। যারে কয় পুত্র রত্ন, আপনার এই পোলা ঠিক তাই।' পরীক্ষায় ছেলের কৃতিত্বের জন্য ভুবনেশ্বরী দেবী প্রতিবেশিনীদের মিষ্টি বিতরণ করেছিলেন।

একদিন বড়ছেলেকে ডেকে জগন্নাথ জিজ্ঞাসা করলেন, মেঘনাদ এখন করবে কি?

—কলেজে পড়বে।

—কলেজে পড়াবার টাকা কোথায় আমাদের?

—সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না বাবা। খরচ আমি দেব। মেঘনাদ স্কলারশিপ পেয়েছে, কলেজে নিশ্চয়ই ওর মাইনে লাগবে না।

পিতা ও পুত্রের কথার মাঝখানে ভুবনেশ্বরী দেবী এসে বলেন, যদি মাইনে লাগে আমার গয়না বেচে সে টাকা আমি যোগাব।

ঢাকায় তাঁর স্কুল জীবনের সহপাঠী নিখিল রঞ্জন সেন লিখেছেন : মেঘনাদ ১৯০৫ সালে গ্রামের স্কুলে পাঠ শেষ করে ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে (এখনকার সপ্তম শ্রেণী) ভর্তি হন। লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে গোটা বাংলা প্রদেশের ওপর দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের একটা প্রবল ঝড় সেই প্রথম বয়ে গিয়েছিল। এর ফলে সমস্ত বাংলা থেকে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটা নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। বৈপ্লবিক আন্দোলনের উদ্ভব ও সেইসঙ্গে বিলিতি জিনিসের বদলে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহ—এই দুটি বিষয়ের স্মৃতি আমার বেশ মনে আছে। বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে সারা বাংলায় ধর্মঘটের হিড়িক পড়ে গিয়েছিল—কিশোর মেঘনাদ, আমি ও আমাদের আরো কয়েকজন সহপাঠী স্কুল থেকে চলে আসি। আন্দোলন মিটে গেলে যারা কলেজিয়েট স্কুলে ফিরে যায়নি তাদের সার্টিফিকেটে 'চরিত্র' সম্পর্কে মন্তব্য লেখা হয়েছিল অসন্তোষজনক। সাহা ছিল স্কুলের সেরা ছাত্র। তখন যাঁরা তাকে এইভাবে বরখাস্ত করেছিলেন তাঁরা কল্পনা করতে পারেননি যে, ত্রিশ বছর বাদে ঐ কলেজিয়েট স্কুলের কর্তৃপক্ষ সাহাকে স্কুলের একজন শ্রেষ্ঠ প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে একটিবার স্কুল পরিদর্শন করতে আমন্ত্রণ করবেন।

'স্কুলে ও কলেজে মেঘনাদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল গণিতের প্রতি। ইতিহাস ছিল তার দ্বিতীয় অনুরাগের বিষয়। স্কুলে থাকতেই সে টডের 'রাজস্থান' পড়ে শেষ করেছিল এবং রাজপুত ও মহারাষ্ট্রের বীরত্বের অন্যান্য কাহিনীর সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিল। তখন জাতীয় উন্মাদনার দিন, প্রতিটি তরুণ বাঙালীর মন তখন দেশপ্রেমে ভরপুর ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ছিল। কিন্তু পরেও দেখেছি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি সাহার অনুরাগ বা আকর্ষণ বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। এই সম্পর্কে তাঁর পঠিত ইতিহাস সাহিত্যের পরিমাণ নেহাৎ কম ছিল না। তাঁর ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা দেখে

আমরা অবাক হতাম। পরবর্তীকালে নানা রকম বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকলেও, তিনি ভারতীয় ইতিহাস সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠে সময় পেতেন এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিকদের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁকে আলোচনা করতে দেখেছি। ১৯০৯ সালে সাহা কে. এল. জুবিলি স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে ঢাকা কলেজে আই. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন।

এইভাবেই মেঘনাদের গৌরবময় ছাত্রজীবনের একটি অধ্যায় শেষ হয়।

॥ দুই ॥

১৯০৯।

শুরু হয় মেঘনাদের দেদীপ্যমান ছাত্রজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।

তাঁকে ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দেওয়া হলো আই. এস-সি ক্লাসে। তখনো ঢাকা কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়নি। সরকারী কলেজ। কলকাতায় যেমন প্রেসিডেন্সি কলেজ, তেমনি তখন পূর্ব বাংলায় ঢাকা কলেজের খুব নাম-ডাক ছিল। তখন এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আর্চবোল্ড সাহেব—ডাব্লিউ. জে. আর্চবোল্ড। তিনি ছাত্রদের ইংরেজির ক্লাস নিতেন। রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন ডক্টর ই. সি· ওয়াটসন ও হরিদাস সাহা ; পদার্থ বিজ্ঞানে ছিলেন অধ্যাপক বি. এন· দাস আর গণিতের জন্য ছিলেন অধ্যাপক নরেশ চন্দ্র ঘোষ এবং অধ্যাপক কে. পি. বসু। চতুর্থ বিষয় হিসাবে মেঘনাদ অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ সেনের কাছে জার্মান ভাষা শিখতেন। অধ্যাপক সেন তখন রসায়নে ডক্টরেট ডিগ্রি নিয়ে ভিয়েনা থেকে ফিরেছেন। তিনি খুব ভাল জার্মান জানতেন।

কলেজে অধ্যক্ষ মেঘনাদের প্রতিভার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বলতেন, সাহা একটি প্রতিভা। অন্যান্য অধ্যাপকরাও তাঁর

সম্পর্কে ঐ রকম ধারণা পোষণ করতেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পর মেঘনাদ যখন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে চলে আসেন তখন অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড খুব দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। মেঘনাদও অধ্যক্ষের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতেন। এমন কি চাকরি থেকে অবসর নিয়ে যখন তিনি বিলাত চলে যান, সাহা তখনো তাঁকে চিঠিপত্র লিখতেন। মেঘনাদ বলতেন, ঢাকা কলেজে আমাদের প্রিন্সিপাল একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের আচার-আচরণ যাতে শিষ্টাচারপূর্ণ হয়, তাদের চরিত্র যাতে আদর্শস্থানীয় হয়, তিনি সবসময় সেইদিকে দৃষ্টি রাখতেন।

ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মেঘনাদ তৃতীয় স্থান অধিকার করে তাঁর শিক্ষক ও সহপাঠীদের চমৎকৃত করেন। গণিত ও রসায়নে তিনি প্রথম হয়েছিলেন। একজন মফঃস্বলের ছাত্রের পক্ষে এ বড়ো কম কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। 'চতুর্থ বিষয়টিতে অর্থাৎ জার্মান ভাষায় কম নম্বর পাওয়ার জন্য আমি প্রথম হতে পারিনি।' এই কথা বলতেন মেঘনাদ। সে বছর (১৯১১) ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান যিনি লাভ করেছিলেন তিনি হলেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সত্যেন বোস। পরীক্ষার এই ফলাফলের জন্য মেঘনাদ ও সত্যেন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যদিও তাঁদের দুজনের মধ্যে তখনো পর্যন্ত চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেনি।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, বাধ্যতামূলক তিনটি বিষয় ছাড়া কলকাতার ছাত্ররা একটি চতুর্থ বিষয় গ্রহণ করতেন, কিন্তু মফঃস্বল কলেজগুলিতে তখন এরকম কোন সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এই কারণেই কলকাতার ছাত্রদের পক্ষে সর্বসমেত অধিক নম্বর পাওয়া সহজ ছিল। যদি কোন পরীক্ষার্থী চতুর্থ বিষয়ে ৬০ নম্বরের বেশি পেতেন তবে সেই নম্বর তাঁর অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে যোগ হতো এবং এর ফলে পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করা তাঁদের পক্ষে সহজতর হতো।

সেইজন্যই তো কলকাতার ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে মেঘনাদ চতুর্থ বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন জার্মান ভাষা যা শিখতে কোন ল্যাবোরেটরির দরকার হতো না।

১৯১১।

মেঘনাদ উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য কলকাতায় এলেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে বি. এস-সি ক্লাসে গণিতে অনার্স সহ ভর্তি হলেন। একে শহর কলকাতা, তার ওপর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া —খরচ বড়ো কম নয়, বিশেষ করে মেঘনাদের মতো একজন দরিদ্র গৃহস্থের ছেলের পক্ষে। এখানকার খরচ চালাবার জন্য তাঁকে প্রধানত নির্ভর করতে হতো জলপানির (Stipend) টাকার ওপর। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর অধ্যক্ষ আর্চবোল্ড সাহেব তাই প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষের কাছে মেঘনাদ যাতে বিনা বেতনে পড়তে পান তারই সুযোগ করে দেবার জন্য সুপারিশ করে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তাঁর সেই চিঠিতে কাজ হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বিনা বেতনে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। জলপানির টাকায় তিনি অন্যান্য খরচ চালাতেন। মেঘনাদ অত্যন্ত সাদা-সিধা জীবনযাপন করতেন, বিলাসিতা তাঁকে কোনদিন স্পর্শ করতে পারে নি। পোশাকে পরিচ্ছদে তিনি সাধারণের চেয়েও সাধারণ ছিলেন। কখনো খাটো ধুতি ছাড়া লম্বা কোঁচার ধুতি তাঁকে তাঁর ছাত্রজীবনে কেউ পড়তে দেখেনি।

মেঘনাদ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এলেন তখন এই শিক্ষায়তনের শিক্ষকগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন পার্সিভাল সাহেব, মনোমোহন ঘোষ, প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ (এঁরা ইংরেজি পড়াতেন); বঙ্কিম দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, সি. ই. কালিস ও ডি. এন. মল্লিক (গণিত); জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র (পদার্থ বিজ্ঞান)

আর প্রফুল্লচন্দ্র রায় (রসায়ন)। চাঁদের হাট বললেই হয়। তবে এঁদের মধ্যে ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় ছিলেন তিনজন—পার্সিভাল, জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। এঁদের কাছে পাঠ গ্রহণ করা ছাত্ররা সৌভাগ্যের বিষয় বলে মনে করতেন। প্রথম দু'বছর (১৯১১-১৯১৩) মেঘনাদ ইডেন হিন্দু হোস্টেলে ছিলেন। পরে ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে একটি মেসে উঠে যান। তখনকার দিনে কলকাতায় এটি ছাত্রদের খুব বিখ্যাত মেস ছিল।

তিনি যখন বি. এস-সি ক্লাসে ভর্তি হন, তখন তাঁর সহপাঠীরূপে মেঘনাদ যাঁদের পেয়েছিলেন সেই তালিকায় ছিলেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সত্যেন বোস, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিল রঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার, সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ইনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন ও স্বামী নিবেদানন্দ নামে পরিচিত হন), শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অমরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। সেই সময় সিংহল থেকে একটি ছাত্র এসে তাঁদের সহপাঠী হয়েছিলেন ; তার নাম সারাবেন মুট্টো। সত্যেন বোস, নিখিলরঞ্জন ও মেঘনাদ গণিতে অনার্স নিয়ে পড়তেন আর জ্ঞানচন্দ্র ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ রসায়ন নিয়ে পড়তেন। প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশ ও নীলরতন ধর—এঁদের চেয়ে যথাক্রমে এক শ্রেণী ও দুই শ্রেণী ওপরে পড়তেন।

শিক্ষক ও ছাত্র মিলে প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন যেন চাঁদের হাট —এতগুলি প্রতিভাবান ছাত্রের সমাবেশ এর আগে বা পরে এই শিক্ষায়তনে দেখা যায়নি। এইসব ছাত্র যখন দল বেঁধে কলেজের খাড়া সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করত, তখন তাদের প্রতিভার আলোয় কলেজের ভবনটি যেন ঝলমল করে উঠতো। এই ছাত্রগোষ্ঠীর মধ্যে মেঘনাদ সাহা (১৯৩৪), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৯৩৯), সত্যেন বোস, (১৯৪৪) ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৯৫২) ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এঁদের পরস্পরের মধ্যে ১৯১১ সালে যে প্রতিযোগিতা দেখা গিয়েছিল তা উত্তরকালে

তাঁদের গবেষক জীবনে, এবং শিক্ষকজীবনেও পরিলক্ষিত হতো। এমন কি বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও তা বিদ্যমান ছিল। পণ্ডিত হিসাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসাবে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও বিদগ্ধ সমিতির সভাপতিরূপে এবং দেশ-বিদেশে বহুবিধ সম্মানের অধিকারী হিসাবে এই ছাত্রগোষ্ঠী শুধু যে তাঁদের ব্যক্তিগত প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, সেই সঙ্গে তাঁরা বিজ্ঞানজগতে তাঁদের জন্মভূমিরও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। এমনটি এর আগে কখনো দেখা যায় নি। পরবর্তীকালের গবেষকদেরও অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাই বলছিলাম, প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন যেন চাঁদের হাট বসেছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে মেঘনাদ আরো অনেকের সংস্পর্শে এসেছিলেন যাঁরা উত্তরকালে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। এইখানেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয়। সুভাষচন্দ্র তাঁর চেয়ে তিন শ্রেণী নিচে পড়তেন, তবে তাঁর দুই অগ্রজ মেঘনাদের সহপাঠী ছিলেন। স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন এই কলেজের একজন ছাত্র। তিনি ১৯১০ সালে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে স্নাতক হয়েছিলেন এবং তিনিও ইডেন হিন্দু হোস্টেলের একজন অধিবাসী ছিলেন। মেঘনাদের ছাত্রজীবনে রাজেন্দ্রপ্রসাদ তখন একজন উদীয়মান ব্যবহার-জীবী ছিলেন। হোস্টেলের ছাত্রদের অনুরোধে তিনি মাঝে মাঝে এসে হোস্টেলের সামাজিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে মেঘনাদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও তাঁর প্রিয় ছাত্রদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। আচার্য রায়ের ছাত্রদের মধ্যে তিনি ডক্টর নীলরতন ধরের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এই সংস্পর্শের প্রভাব তাঁর জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। তিনি যে ছাত্রজীবনে সরল জীবন ও উচ্চ চিন্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছিলেন তার মূলে ছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। যুবক মেঘনাদ সেই

যে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিলেন তা স্থায়ী হয়েছিল।

প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকতেই মেঘনাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি যেন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানের প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ বোধ করেন এবং ইহাই সেদিন তাঁর জীবনের গতি ঠিক করে দিয়েছিল চূড়ান্তভাবে। তিনি বিজ্ঞানের অনুশীলনেই জীবন অতিবাহিত করবেন—কলেজে থাকতেই এই যে সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা চরিতার্থ করতে তিনি তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন ডি. এন. মল্লিক এবং তিনি তাঁর ক্লাসের যারা সেরা ছাত্র তাদের সম্পর্কে বিশেষ যত্ন নিতেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে মেঘনাদ অধ্যাপক মল্লিকের কাছে দু'বছর অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিলেন। অধ্যাপক মল্লিক বলতেন, সত্যেন আর মেঘনাদের মতো ছাত্র আমার জীবনে কখনো দেখিনি। কলেজে একবছর তিনি অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসুর কাছেও পদার্থবিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু মেঘনাদের আগ্রহটা ছিল গাণিতিক পদার্থবিদ্যার দিকে, তাই অধ্যাপক বসুর ল্যাবোরেটরি তাঁকে খুব বেশি আকৃষ্ট করতে পারেনি।

প্রেসিডেন্সি কলেজে সত্যেন বোস ও মেঘনাদ সাহার মধ্যে যেমন প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়, তেমনি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতারও সূচনা হয়। ১৯১৩ সালে দুজনে গণিত বিষয়ে অনার্স সহ বি. এস-সি পরীক্ষা দিলেন, ফলাফলের জন্য সবাই অগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে। যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরুলো। দেখা গেল প্রথম স্থান অধিকার করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় মেঘনাদ এবং তৃতীয় নিখিলরঞ্জন। সে বছর কেমব্রিজের সিনিয়র র‍্যাংলার খুব কঠিন প্রশ্নপত্র রচনা করেছিলেন। এরা তিনজনেই মিশ্র গণিত নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম. এস-সি পড়েন। এম. এস-সি ক্লাসে

অধ্যাপক ডি. এন. মল্লিক, অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক জে. এম. বোস, অধ্যাপক কালিস (Callis) প্রভৃতিকে তাঁরা শিক্ষকরূপে পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার গণিত শিক্ষক মহলে এঁদের খ্যাতি ছিল সমধিক। ১৯১৫ সালে এম. এস-সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ-মেঘনাদের প্রতিযোগিতার ফল কিন্তু আগের মতো হলো না। এবার তাঁরা দুজনেই প্রথম হলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মিশ্র গণিতে আর ফলিত গণিতে মেঘনাদ। অসুস্থতার জন্য সে বছর নিখিলরঞ্জন পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা থেকে শুরু করে সর্বশেষ পরীক্ষা পর্যন্ত সমভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল রেখে মেঘনাদ এইভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের পাঠ সমাপ্ত করেন। ছাত্রাবস্থায় যাঁদের তিনি সতীর্থরূপে পেয়েছিলেন—সত্যেন বোস, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিন বিহারী সরকার প্রমুখ, তাঁরা সকলেই পরবর্তীকালে কৃতী বিজ্ঞানী হিসাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে বা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এতগুলি বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রের সমাবেশ এর আগে বা পরে আর কখনো দেখা যায়নি, একথা আগেই একবার উল্লিখিত হয়েছে।

মেঘনাদ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম. এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চলে আসার কিছুদিন পরে সেখানে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ১৯১৫ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজের জনৈক ইংরেজ অধ্যাপক (মিঃ ওটেন) ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি দুর্ব্যবহার করায় একদল ছাত্র উত্তেজিত হয়ে তাঁর গায়ে হস্তক্ষেপ করে। সুভাষচন্দ্র তখন এই কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এবং ছাত্রসমাজের মধ্যমণি। যদিও সুভাষচন্দ্র নিজে মিঃ ওটেনকে আঘাত করেন নি, তবু সন্দেহ বশে তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত (rusticate) করা হলো। এই সময়কার কথা উল্লেখ করে মেঘনাদ সাহা বলতেন, 'ওটেনের ঘটনাটাকে উপলক্ষ করে সেদিন কলকাতার

কলেজীয় ছাত্রমহলে যে গভীর আলোড়ন সঞ্চার হয়েছিল তা আমার আজো বেশ মনে আছে।'

সসম্মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল মেঘনাদের সামনে। এমনি সমস্যা একদিন দেখা দিয়েছিল স্যর সি. ভি. রমনের জীবনে। তিনিও বিজ্ঞানের কৃতীছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সামনে গবেষণার পথ খোলা ছিল না। ভারত সরকারের অর্থবিভাগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে তাঁকে চাকরি নিতে হয়েছিল। মেঘনাদও তেমনি এম. এস-সি পাশ করার পর ঐরকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবেন ঠিক করলেন। কিন্তু ছাত্রজীবনে প্রশংসনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শন করা সত্ত্বেও ঐরকম পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া হলো না।

অনুমতি না দেওয়ার অবশ্য অন্য কারণ ছিল। ছাত্রজীবনেই তিনি রাজনীতির চর্চা করতেন। পুলিন দাস ও বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯১৫ অবধি মেঘনাদ ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের মেসে থেকে কলেজে পড়তেন। তখন ঐ মেসে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন নীলরতন ধর, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি ও জে. এন. ধর। মেঘনাদ যখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন তখন থেকেই তিনি পুলিন দাসের সংস্পর্শে আসেন। পুলিন দাস ঢাকায় অনুশীলন সমিতি গড়ে তুলেছেন; সেই সমিতির সভ্যদের লাঠি খেলা ও ড্রিল শেখানো হতো। বেশির ভাগ সভ্যই ছিল স্কুল-কলেজের ছাত্র। মেঘনাদও এই সমিতির একজন সভ্য ছিলেন। অনুশীলন সমিতি কিন্তু আসলে একটি বৈপ্লবিক সংস্থা ছিল ও এর উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে ইংরেজ শাসন উৎখাত করে দেওয়া। ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে বাঘা যতীন প্রায়ই আসতেন ও এখানে ছাত্রদের মধ্যে তিনি বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করতেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ

হয়েছে। যে-সব বিপ্লবী তখন জার্মানিতে থেকে কাজ করছিলেন তাঁরা কলকাতার বাঘা যতীনকে খবর পাঠালেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জার্মান সম্রাট কাইজারের খুব সহানুভূতি আছে এবং তিনি শীঘ্রই অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই একখানা জাহাজ পাঠাচ্ছেন। একদিন সন্ধ্যায় বাঘা যতীন মেসে এলেন ও ছাত্রদের ডেকে বললেন, সুন্দরবনে রায়মঙ্গলের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বোঝাইকরা একটা জার্মান জাহাজ আসছে। সেই জাহাজ থেকে ঐগুলো নামিয়ে নিতে হবে। তোমাদের মধ্যে কে কে এই কাজের ভার নেবে? মেঘনাদ যেতে রাজী হলেন। কিন্তু সেই জাহাজ এলো না। ইতিমধ্যে বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে গেরিলা যুদ্ধে বাঘা যতীন ও তাঁর চারজন সঙ্গীর মৃত্যু হয়। অনুশীলন সমিতি ও বাঘা যতীনের সঙ্গে মেঘনাদের ঘনিষ্ঠতার খবর পুলিশ রাখত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাংলার তরুণদের মনে দেশপ্রেমের আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং কলকাতায় ছাত্রমহলে তখন বেশ উত্তেজনা দেখা গিয়েছিল। মেঘনাদও সেই উত্তেজনার আবর্তে কিছুদিন পড়েছিলেন। এইসব কারণেই সরকারী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবার অনুমতি তিনি পাননি এবং কিছুকাল তাঁকে বিপদ ও অনিশ্চয়তার ভেতর দিয়ে যেতে হয়েছিল।

তখন তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি রাজনীতি থেকে দূরে থাকবেন। তাঁরই সহপাঠী ও বন্ধু শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ (যিনি মেঘনাদের সঙ্গে একত্রে মেসে থাকতেন) কিন্তু রাজনীতির আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। বাড়ির অবস্থা তখন খুব ভাল নয়। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছেন, তাই এই সময়ে তাঁর অগ্রজ মেঘনাদকে একটি চিঠি লিখে জানালেন যে, বাবার মুদিখানার দোকানটি খুব ভাল চলছে না, এখনো ছোট ভাইটির লেখাপড়া বাকী। তাই সকলের আশা মেঘনাদ এখন সংসারের দায় কিছুটা বহন করেন। দাদার কাছ থেকে এই চিঠি পেয়ে মেঘনাদ সমস্ত রাজনৈতিক সংস্রব বর্জন করেন। বর্জন করার আরো একটা কারণ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ

পরীক্ষা দেওয়ার সময় থেকে তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল বিজ্ঞানচর্চার প্রতি একটা প্রবল আগ্রহ।

সরকারী চাকরি পাওয়ার আশা যখন রইল না তখন মেঘনাদ ঠিক করলেন যে, তিনি ফলিত গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানে গবেষণা চালিয়ে যাবেন। এই সময়ে তাঁর কনিষ্ঠ ভাইটির (ডাক্তার কানাইলাল সাহা) উচ্চশিক্ষার জন্য তাঁকে দেশ থেকে তাঁর কাছে আনিয়েছিলেন। নিজের ও ভাইয়ের জীবিকানির্বাহের জন্য এই সময়ে মেঘনাদকে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনটা প্রাইভেট ট্যুইশানি করতে হতো। শ্যামবাজার থেকে ল্যান্সডাউন রোড—দিনে দুবার করে তিনি সাইকেলে পাড়ি দিতেন। যুগে যুগে জ্ঞান ও সত্যের পথে যাঁরা চলেন তাঁদের সকলকেই বুঝি এইরকম কঠোর পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে।

॥ তিন ॥

—সত্যেন, তুই এখন কি করছিস ?

—ট্যুইশানি। তুই ?

—ডিটো—শ্যামবাজার থেকে ল্যান্সডাইন হু'হুটো ট্যুইশানি করছি সাইকেলে চেপে। শুনলাম পাটনা কলেজে দরখাস্ত করেছিস ?

—করেছিলাম। তার জবাবও এসে গেছে।

—কি ? চাকরি খালি নেই ?

—ঠিক তা নয়। ওরা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম. এস-সি চায় না, চায় একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর এম. এস-সি।

—আর কোথায় দরখাস্ত করেছিস ?

—হাওয়া অফিসে। ঐ একই জবাব এসেছে। তুই কি করছিস ?

—আমি এখন য়্যাপ্লায়েড ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করছি।

—শুনছি ইউনিভার্সিটি শীগ্‌গির সায়েন্স কলেজ খুলবে। মনে হয় সেখানে আমাদের chance হতে পারে।

একদিন সন্ধ্যায় হেহুয়াতে একটি বেঞ্চিতে বসে দুই বন্ধুর মধ্যে

এই রকম আলাপ হচ্ছিল। দুজনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন কিন্তু দুজনকেই তখন দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দুজনেই তখন ভাবছেন—কি করা যায়। তবে মেঘনাদ ছিলেন উদ্যমশীল। তাঁর সামনে তখন পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। তাই আমরা দেখতে পাই যে এম. এস-সি পাশ করার পরেই মেঘনাদ গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে আরো পড়াশুনা করতে থাকেন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই বিষয়ে জীনসের বইখানি[১] প্রাগ্রসর ছাত্রদের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুপারিশ করা হতো। এই কঠিন বইটি সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পড়ে শেষ করলেন সাহা। কিন্তু তিনি এইখানেই থামলেন না। তাঁর আগ্রহ অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। ক্রমে তিনি লোরেনজের ইলেকট্রন থিওরি ও আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ থিওরির সঙ্গে যেমন পরিচিত হলেন তেমনি কোয়াণ্টাম থিওরি নিয়েও গভীরভাবে আলোচনা করলেন। ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী নীল্‌স বোরের এ্যাটম থিওরি তখন বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোয়ানটামবাদ সম্পর্কে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। ইলেকট্রনের আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে সাহা এই সময়েই তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি রচনা করেছিলেন।

বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা ভারতে বিজ্ঞান শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সুতরাং এর ইতিহাস একটু বলা দরকার। ১৯০৬ সাল থেকে ১৯২৪ সাল—এই আঠার বছরের মধ্যে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চৌদ্দ বছর উপাচার্য ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এই শিক্ষায়তনের নির্মাতা। তাঁরই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় এক নব কলেবর ধারণ করে ও স্নাতকোত্তর

১. Treatise on Mathematical Theory of Electricity and Magnetism : James Jeans.

শ্রেণী খোলা হয়। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে এম. এ ও এম. এস-সি পড়ানর ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৭ সালে স্থাপিত হওয়ার পর এতদিনে বিশ্ববিদ্যালয় একটি teaching universty-তে পরিণত হয়। এতকাল এখানে শুধু পরীক্ষা নেওয়া হতো। পঠন-পাঠনের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। আশুতোষের প্রতিভা ও পরিশ্রম অসাধ্য সাধন করল।

১৯০৭ সাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে যদিও বিজ্ঞানচর্চা আরম্ভ হয়, কিন্তু উপযুক্ত অর্থ ও বন্দোবস্তের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তখনো পর্যন্ত এম. এস-সি-তে বিজ্ঞানশিক্ষা আরম্ভ করতে পারেন নি। তখনকার দিনে প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো দু'একটি বড় কলেজেই এম. এস-সি ক্লাস খোলবার উপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত সেখানেই এম. এস-সি পড়ানো হতো।

এই সময়ে বাংলার শিক্ষাজগতের দুই দানবীর স্যর তারকনাথ পালিত এবং স্যর রাসবিহারী ঘোষের বিপুল দানকে কেন্দ্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। তারকনাথ পালিত দিলেন নগদ পনর লক্ষ টাকা আর বিরানব্বই নম্বর আপার সারকুলার রোডের বিরাট জমি আর রাসবিহারী ঘোষ দিলেন দশ লক্ষ টাকা। এরপর বিজ্ঞান কলেজে খয়ড়ার মহারাজা গুরু প্রসন্ন সিংহ পাঁচলক্ষ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে আশুতোষ ভারত সরকারের কাছেও অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। যে কোন কারণেই হোক ভারত সরকার এবিষয়ে অর্থ সাহায্যের তেমন ভরসা দেন নি কিন্তু আশুতোষ হতোদ্যম হলেন না। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ও পরিশ্রমে ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় এবং ঐ বছর ২৭ মার্চ বিশিষ্ট জনমণ্ডলীর সামনে ৯২ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে, বিজ্ঞান কলেজ ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়। কিন্তু

১। বর্তমান নাম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড

১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ায় প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৯১৭ সাল থেকে।

৯২ আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে বিজ্ঞানের সকল বিভাগের স্থান সংকুলান সম্ভব হয়নি। এখানে প্রথমে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ফলিত গণিত, মনোবিদ্যা ও শারীরবৃত্তের অধ্যয়ন ও গবেষণার বন্দোবস্ত করা হয়। পাঁচটি অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়। রসায়ন শাস্ত্রে (অজৈব) প্রথম পালিত অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ইনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অবসর নিয়েছেন), প্রথম ঘোষ অধ্যাপক (জৈব রসায়ন) প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র এবং প্রথম খয়ড়া অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ফলিত গণিতশাস্ত্রে প্রথম ঘোষ অধ্যাপক ডক্টর গণেশপ্রসাদ এবং ফলিত পদার্থবিদ্যায় প্রথম ঘোষ অধ্যাপক মণীন্দ্রনাথ ঘোষ।

এই সময়ে একদিন স্যর আশুতোষ ডেকে পাঠালেন সত্যেন্দ্রনাথ, মেঘনাদ প্রমুখ তরুণ বিজ্ঞানীদের। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে পদার্থ বিজ্ঞানের ক্লাস শুরু হলে তোরা পড়াতে পারবি ?'

পারব। দুজনেই উত্তর করলেন।

তখন স্যর আশুতোষ বললেন, তার আগে তাহলে তোদের তৈরি হতে হবে—এক বছর পড়ে নিতে হবে।

দুজনের জন্যই বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিলেন আশুতোষ। এক বছর বিশেষ পাঠ গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই রত্ন—সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ—বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হলেন। দু' জনেই মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা উভয় বিভাগেই পড়াবার এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগে কোন অধ্যাপক না থাকায় বিভাগটি গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। উচ্চতর পদার্থবিদ্যা পঠন-পাঠন ও গবেষণায় তাঁরা নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। তাঁদের মিলিত চেষ্টার ফলস্বরূপ গ্যাসীয় পদার্থের অবস্থা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো বিলাতের বিশিষ্ট পত্রিকা ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন-এ

(Philosophical Magazine)। মৌলিক প্রবন্ধ ভিন্ন এই পত্রিকায় কোন সাধারণস্তরের লেখা ছাপা হয় না। এই কাগজে কারো একটা রচনা প্রকাশিত হওয়া মানেই তার বৈজ্ঞানিক প্রতিভার প্রাথমিক স্বীকৃতি। এই নিবন্ধে মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ যে সূত্র প্রমাণ করেন সেটি 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' (Saha-Bose Equation of State) নামে সুপরিচিত হয়। কলকাতায় যখন এই সংবাদ এলো তখন সবচেয়ে খুশি হয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র। এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান কলেজেরও গৌরব বৃদ্ধি পেলো।

দেশে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, ভারত সরকার এটা চাননি এবং সরকারী নীতির বিরোধিতা অতিক্রম করেই আশুতোষ মহানগরীর বুকে স্থাপন করেছিলেন ইউনিভারসিটি সায়েন্স কলেজ। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আশুতোষের এই প্রয়াসকে সার্থক করে তুলতে সেদিন যে সব প্রবীণ ও তরুণ অধ্যাপক এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের প্রত্যেকেরই স্মৃতি এই শিক্ষায়তনের প্রতিটি ইস্টকখণ্ডে উৎকীর্ণ আছে। কতকাল আগে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স নামক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করে এদেশে বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। আর আজ স্যর আশুতোষ সরকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করে এক অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন। সমস্ত ভারতবর্ষে এর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী এবং বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক হিসাবে স্যর সি. ভি. রমন গবেষণার যে সুযোগ পেয়েছিলেন তা-ই তাঁকে সেদিন নোবেল পুরস্কার লাভে সহায়তা করেছিল।

এই প্রসঙ্গে মেঘনাদ সাহা যথার্থই বলেছেন: 'সরকারী ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন করা নিঃসন্দেহে একটি দুঃসাহসিক উদ্যম ছিল। যোগ্য শিক্ষক নির্বাচনের ওপর এর সফলতা নির্ভর

করেছিল। স্বর্গত স্যর আশুতোষ তরুণদের ওপর বিশেষ আস্থা পোষণ করতেন, কারণ তারা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত ছিল। তাঁর নির্বাচন যে বিস্ময়কর ছিল গোড়ার দিকে তার প্রমাণ আমরা তিন জন—আমি, বোস ও রমন। যোগ্য পদের জন্য যোগ্য ব্যক্তিকে নির্বাচন করার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল তাঁর এবং এই কারণেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগ ও একাধিক বিষয়ে একাধিক ফ্যাকালটি খোলা সম্ভব হয়েছিল। এইভাবেই তো আশুতোষ একদিন স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের অধ্যাপক করে এনেছিলেন।'

ফলিত গণিতের অধ্যাপক গণেশ প্রসাদের সঙ্গে সাহা বা বোস কারো বিশেষ বনিবনা হলো না। তখন আশুতোষের অনুমতি অনুসারে এঁদের দুজনকে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয় যদিও ঐ বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান বি. এস-সি পাশ কোর্সের অধিক ছিল না। কিন্তু এই বিভাগে বদলি হবার পর মেঘনাদ নিজ থেকেই পদার্থবিদ্যার তাত্ত্বিক ও হাতেকলমে গবেষণার কাজে নিজেকে নিয়োগ করলেন। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে দিলেন এ দুরূহ কাজে এবং কোন অভিজ্ঞ বা বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের কাছ থেকে তিনি কিছুমাত্র সহায়তা পান না। এ ছিল মেঘনাদের সম্পূর্ণ একক সাধনা। এক্ষেত্রে তাঁকে একজন স্বয়ংসিদ্ধ (Selfmade) বিজ্ঞানী বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এস-সি ক্লাস খোলা হলো বটে কিন্তু বিভাগটি তখনো পর্যন্ত ঠিকমতো সংগঠিত হয়ে উঠেনি—না ঠিক হয়েছে পাঠ্যসূচী, না গঠিত হয়েছে উপযুক্ত ল্যাবোরেটরি। ১৯১৭ সালে মেঘনাদ যখন লেকচারার নিযুক্ত হলেন তখন তাঁকে ও সত্যেন বোস, এস. কে মিত্র ও পি. এন. ঘোষ প্রভৃতি তরুণ অধ্যাপকদের ওপর এই বিভাগটি গড়ে তুলবার দায়িত্ব দেওয়া হল। ১৯১৮ সালে রমন এসে যোগদান করলেন। তাপবিজ্ঞান (Heat) ও থার্মোডাইনামিক্স—এই দুটি বিষয়ের ভার দেওয়া হয় মেঘনাদকে।

যদিও এই দুটি বিষয় সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না অথচ এই দুটি বিষয়ের দায়িত্ব নেবার লোকও ছিল না।

তখন নিজের চেষ্টায় তিনি আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সম্পর্কে অধ্যাপনা করতে থাকেন এবং এই বিষয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরি খুবই সহায়ক হয়েছিল। এই সময়ে কোয়ানটমবাদ[২] ও আপেক্ষিকতাবাদের উদ্ভবের ফলে পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পাল্টাতে শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নীলস্ বোরের হাইড্রোজেন বর্ণালি তত্ত্বও উল্লেখযোগ্য। কলকাতায় তখন পদার্থবিদ্যার যেসব প্রবীণ অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের কেউই আধুনিক পদার্থবিদ্যা সম্পর্কে কোন খবরই রাখতেন না। তাঁরা তাঁদের পঠন-পাঠন ক্লাসিকাল ফিজিক্স-এর গণ্ডীর মধ্যেই নিবদ্ধ রেখেছিলেন। এম.এস-সি ক্লাসের পাঠ্যসূচী বলতে এই-ই ছিল। আশুতোষ যে কয়জন নবীন লেকচারারকে নিয়োগ করেছিলেন বিজ্ঞান কলেজে, তাঁরাই প্রাচীন ধারা বর্জন করে এম. এস-সির সিলেবাসকে যথার্থ আধুনিক রূপ দিলেন। শুধু এই জন্যই স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যে বিজ্ঞান কলেজের খ্যাতি সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

নিজে পড়াশুনা করতে গিয়ে মেঘনাদ তাপবিকিরণের (radiation) কোয়াণ্টামবাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন—পরিচিত হলেন আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কার আপেক্ষিকতাবাদের সঙ্গে; আইনস্টাইনের এই সূত্র দুভাগে বিভক্ত—বিশেষ ও সাধারণ। প্লাঙ্কের সূত্রের পাঁচবছর পরে আইনস্টাইনের সূত্র আবিষ্কৃত হয় ১৯০৫ সালে। সেই যে তিনি কলেজে পড়বার সময়ে জার্মান শিখেছিলেন,

---

২। Quantum theory—বিকিরিত শক্তির ভরতত্ত্ব। কোন উত্তপ্ত বস্তু বা আলোকশিখা থেকে যে তাপশক্তি বিকিরিত হয়, তা নিরবচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয় না, হয় শক্তির সূক্ষ্ম কণিকার তরঙ্গায়িত বিচ্ছুরণে। এই শক্তি কণিকাগুলিকে বলা হয় 'কোয়াণ্টা'। বিখ্যাত জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই সূত্র আবিষ্কার করেন এই শতাব্দীর সূচনায়।

সেটা তাঁর এখন খুব কাজে এলো, কারণ আইনস্টাইনের সূত্র সম্পর্কিত যাবতীয় সাহিত্য জার্মান ভাষায় নিবদ্ধ ছিল এবং তখনো পর্যন্ত ইংরেজি ভাষায় এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু রচনার অস্তিত্ব ছিল না বললেই হয়। কলকাতায় তখন একমাত্র মেঘনাদ সাহা-ই যে আইনস্টাইনের সূত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন সেই কাহিনী এই বইয়ের গোড়াতেই উল্লিখিত হয়েছে।

এইভাবে নিজের চেষ্টায় পড়াশুনা করবার ফলে, সাহা এই সময়ে কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ রচনা করেন; এগুলি বিলাতের ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিন ও আমেরিকার ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ' প্রকল্পটি এরই অন্যতম ছিল। এই সময়ে তিনি আমেরিকার এ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল-এ 'On Selective Radiation Pressure and its Applications' শীর্ষক একটি মৌলিক মূল্যবান গবেষণা-প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। সেটি ঐ পত্রিকায় অংশত ছাপা হয়, কিন্তু এর বৃহত্তর অংশ ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। ঐ বছর তিনি যখন yerkes মানমন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন তখন একটি ড্রয়ারের মধ্য থেকে ঐটি বের করে তাঁর হাতে ফেরং দেওয়া হয়। বাইরের বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশ করতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মাঝে মাঝে কিরকম অসুবিধা ভোগ করতে হতো সেই কথা মনে করেই তো উত্তরকালে মেঘনাদ নিজেই উদ্যোগী হয়ে 'Science and Culture' নামে একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা বের করেছিলেন। এ বিষয়ে যথাস্থানে বলব।

বিদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভিত্তিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১৮ সালে মেঘনাদকে ডি. এস-সি উপাধিতে ভূষিত করেন—তাঁর পরীক্ষক ছিলেন দুজন ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী। পরের বছর 'On a Physical Theory of Stellar Spectra' এই নিবন্ধের জন্য তিনি লাভ করেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ

ছাত্রবৃত্তি (P. R. S.) ; এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল দশহাজার টাকা ও একটি স্বর্ণপদক। সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরু প্রসন্ন ঘোষ ফেলোশিপ লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মেঘনাদ উচ্চতর গবেষণার জন্য য়ুরোপ যাত্রা করেন। তার বছর খানিক আগে (১৯১৮, জুন) তিনি রাধারানী রায়ের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অধ্যাপক নির্মল কুমার সিদ্ধান্ত, ডক্টর জীবরাজ মেটা প্রভৃতি মেঘনাদের বিলাত গমনের সহযাত্রী ছিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ছাব্বিশ বছর।

॥ চার ॥

উচ্চতর গবেষণার জন্য ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য অনেকদিন থেকেই একবার য়ুরোপ যাওয়ার ইচ্ছা মেঘনাদের ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় তাঁর অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রর মুখে ওদেশের সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরির কথা শুনে অবধি তাঁর মনে এই ইচ্ছা জেগেছিল। এতদিনে তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হলো। গুরুজন এবং তাঁর পূজনীয় অধ্যাপকদের আশীর্বাদ আর সতীর্থগণের শুভ ইচ্ছা নিয়ে তরুণ মেঘনাদ বিলাত যাত্রা করলেন। তিনি গরীবের ছেলে, কত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তবু য়ুরোপ যাওয়ার মতো সঙ্গতি তাঁর ছিল না। বলা বাহুল্য, সেই সুযোগ ছাত্র-সুহৃদ আশুতোষই করে দিয়েছিলেন। এজন্য তাঁর প্রতি মেঘনাদের কৃতজ্ঞতার শেষ ছিল না।

তাঁর য়ুরোপ যাওয়ার আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন একদিন পদার্থবিজ্ঞানের ক্লাসে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্রের মুখে একটি সুন্দর কথা শুনেছিলেন। অধ্যাপক বসু সেদিন তাঁর ছাত্রদের সামনে তড়িৎ-চৌম্বক শক্তি সম্পর্কে একটা experiment দেখাতে দেখাতে বলেছিলেন : 'তোমরা

হ্যামিলটনের সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি মনে রাখবে। তিনি বলতেন, পদার্থ-বিজ্ঞানের দুটো চোখ, একটা হলো তত্ত্ব, অপরটা অনুসন্ধান. গবেষণা তখনি সার্থক হয় যখন এই দুই চোখ দিয়ে কর্মীরা দেখেন।' এই মূল্যবান উক্তির প্রকৃত অর্থটা মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার রূপে যোগদান করার পর উপলব্ধি করলেন। তিনি ছিলেন তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী ; হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ তখন এখানে ছিল না বললেই হয় আর এই বিষয়ে তাঁর শিক্ষারও (training) অভাব ছিল। তাঁর য়ুরোপ যাওয়ার পিছনে সম্ভবত এটাই ছিল প্রধান কারণ। তাঁর মন তখন চাইছিল ওদেশের একটা ভালো ল্যাবোরেটরিতে গিয়ে কিছুকাল কাজ করতে।

লণ্ডনে পৌঁছে মেঘনাদ দেখলেন য়ুরোপে থেকে গবেষণা করা খুবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাঁর পুঁজি ছিল প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশীপের দশহাজার টাকা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুপ্রসন্ন স্কলারশিপের টাকা। আসবার সময় জাহাজ ভাড়াই লাগল কত টাকা। লণ্ডনে এসে তিনি প্রথমেই তাঁর সহপাঠী স্নেহময় দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন একদিন। ইনি তখন ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স য়্যাণ্ড টেকনোলজিতে পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট পাওয়ার জন্য গবেষণা করছিলেন। তিনি মেঘনাদকে অধ্যাপক ফাউলারের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। বললেন, স্পেক্ট্রোসকোপি[১] ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স[২] এই দুটি বিষয়ে তাঁর অগাধ জ্ঞান। এই দুটি বিষয়ে যিনি পথিকৃৎ সেই স্যার নর্ম্যান লকিয়ারের সহকারী ছিলেন ফাউলার।

---

১. Spectroscopy বর্ণালি বিজ্ঞান। সাদা আলোকরশ্মি একটি প্রিজমের (পরকলা কাচ) ভেতর দিয়ে প্রতিসারিত হয়ে যে বিভিন্ন বর্ণচ্ছটা ফুটিয়ে তোলে তাকে বর্ণালি বা spectra বলে।

২. Astrophysics গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন উপাদান, ঔজ্জ্বল্য, জাতি-প্রকৃতি প্রভৃতি বিষয়ক গবেষণা বিজ্ঞান।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে মেঘনাদ পদার্থবিদ্যার সিদ্ধান্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানে প্রয়োগ করে অপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন। বিলাত যাওয়ার আগে ফিলোজফিক্যাল ম্যাগাজিনে তিনি 'On Ionization in the Solar Chromosphere' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন। তিনি যখন লণ্ডনে এসে পৌঁছলেন তখন দেখলেন প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে। ইংলণ্ডের পদার্থ বিজ্ঞানীসমাজে এই প্রবন্ধটি সাহাকে সেদিন পরিচিত করে তুলেছিল। এই প্রবন্ধেই ছিল তাঁর তাপীয় আয়নীকরণ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণটি। জ্যোতিষ্কদের গুণাবলী জানবার পক্ষে এটি খুব সহায়ক বলে গণ্য হয়। তাঁর এই আবিষ্কার সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে কিছু বলব। বড় হয়ে তোমরা এই বিষয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে।

যদি কোন পরমাণু অণু বা মূলক থেকে কোনরূপে একটা ইলেকট্রন বিয়োজিত হয় বা তার সঙ্গে একটা ইলেকট্রন যুক্ত হয় তাহলে এরূপ তড়িতাহিত কণাকে আয়ন (ION) বলে। যে পদ্ধতিতে এটা হয় তার নাম আয়নীকরণ (ionisation)। উচ্চ তাপে জটিল রাসায়নিক অণু বিয়োজিত হয়ে সরল অণুতে পরিণত হয়। আরো উচ্চ তাপে পরমাণুর ইলেকট্রন খসে এগুলি আয়নিত হয়। বর্তমান যুগে পারমাণবিক চুল্লীর কল্যাণে এটা খুব সাধারণ তথ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরমাণু বিয়োজনের ফলে যে আয়ন ও ইলেকট্রনের সমন্বয় সৃষ্টি হয় তাকে প্লাজমা বলে ও এর চর্চার জন্য পদার্থবিদ্যায় একটি নতুন শাখার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু মেঘনাদ যখন গবেষণা আরম্ভ করেন এই ধারণা আদৌ সহজ ছিল না। তিনি কল্পনা করেন যে, নক্ষত্রদের ভেতরে যে উচ্চতাপ আছে, তাতে মূল পরমাণুগুলি আয়নিত হয়ে যায় এবং এদের বর্ণালিতে যে সকল মৌলের উজ্জ্বল রেখা পাওয়া যায় না তার কারণ দেন যে নক্ষত্রের বর্ণালিতে মূল পরমাণুর রেখা থাকা সম্ভব নয়, ওই আয়নিত পরমাণু রেখা পাওয়া যাবে। শুধু কল্পনা করেই ক্ষান্ত হননি, অসাধারণ গাণিতিক প্রতিভায়

তিনি হিসাব করে এদের স্থান নির্ধারণ করেন এবং পর্যবেক্ষকগণ বর্ণালি বিশ্লেষণে এদের ঠিক সেই স্থানে পান। এতেই মেঘনাদের খ্যাতি বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে!

সাহা ফাউলারকে চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন ও এ্যাস্ট্রোফিজিক্স সম্পর্কে তিনি কি কাজ করছেন সেই চিঠিতে সেই বিষয়ে উল্লেখ করেন। ফাউলার সেই চিঠিখানি পাঠ করে মুগ্ধ হন ও তখনি মেঘনাদকে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে কাজ করবার অনুমতি দেন। ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এ্যাণ্ড টেকনোলজির বিরাট ল্যাবোরেটরিতে কাজ করার ফলে তিনি অনেক কিছু শিখলেন নক্ষত্র জগতের বর্ণালি সম্পর্কে এবং এই বিষয়ে ইতিপূর্বে লেখা একটি প্রবন্ধের নাম পরিবর্তিত করেন। ফাউলারের অধীনে কাজ করবার সময় বর্ণালির শ্রেণীবদ্ধকরণ সম্পর্কে জার্মানি ও ইংলণ্ডের বিজ্ঞানীদের অগ্রগতির সঙ্গে পরিচিত হন। কিন্তু সাহা তাঁর উদ্ভাবিত তাপীয় আয়নীকরণের যাথার্থ্য সম্পর্কে হাতে-কলমে জানবার জন্য আগ্রহী হন। ফাউলারের প্রস্তাবক্রমে তিনি তখন বার্লিনের বিখ্যাত রাসায়নিক পদার্থবিদ অধ্যাপক নার্নস্টকে একটি পত্র লিখে তাঁর ল্যাবোরেটরিতে কাজ করবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করলেন।

লণ্ডনে মেঘনাদ সবসুদ্ধ পাঁচ মাস ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে তিনি কেমব্রিজে এসে প্রখ্যাত পদার্থবিদ্ স্যর জে. জে. টমসনের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি তখন সবেমাত্র অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসর গ্রহণ করলেও তিনি ক্যাভেন্ডিস ল্যাবোরেটরিতে প্রায়ই আসতেন ও তরুণ গবেষকদের কাজ খুব আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন। স্যর টমসন প্রায় একঘণ্টা কাল সাহার সঙ্গে তাঁর উদ্ভাবিত তাপীয় আয়নীকরণ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন, কিন্তু হাতে-কলমে পরীক্ষার ব্যাপারে এই ভারতীয় বিজ্ঞানীকে সহায়তা করতে তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তিনি নিজেই তখন অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত

৩

ছিলেন, তাঁর উদ্ভাবিত বিষয়টি পরীক্ষা করা হয়েছে ও ফলাফল সন্তোষজনক হয়েছে। মেঘনাদ এই চিঠিখানি পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন এবং তাঁর তত্ত্বটি যে নির্ভুল তা প্রমাণিত হয়েছে দেখে তাঁর এতদিনের গবেষণা সার্থক জ্ঞান করলেন।

তবুও নিজে একবার হাতে-কলমে পরীক্ষা করবার জন্য তিনি খুবই অস্থির হলেন। মেঘনাদ তাঁর উদ্ভাবিত তাপীয় আয়নীকরণ তত্ত্বটির যাথার্থ্য একটি বীক্ষণাগারে একবার প্রমাণ করে দেখতে চেয়েছিলেন—এটা আজ খুবই আশ্চর্য মনে হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু এখন অনেকেই তাঁর তত্ত্বটিকে নির্ভুল বলেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সমসাময়িক পদার্থবিদদের কাছে এটা ততটা নির্ভুল বলে গৃহীত হয়নি। লণ্ডনে থাকবার কালে মধ্যাহ্ন আহারের সময় তিনি প্রায়ই ইউনিটি বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপক ডোমেনের বীক্ষণাগারে যেতেন। তাঁর দুই বন্ধু—জ্ঞান ঘোষ ও জ্ঞান মুখার্জি তখন এখানে গবেষণা কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এইখানেই তিনি এস. এস. ভাটনগরের সঙ্গে পরিচিত হন ও এই পরিচয় পরে স্থায়ী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। ভাটনগরের অসাধারণ কর্মক্ষমতা ও আগ্রহ দেখে মেঘনাদ তাঁকে পরিহাস করে বলতেন 'স্টিমশিপ ভাটনগর'।

অতঃপর সাহা এলেন বার্লিনে অধ্যাপক নার্নস্ট-এর ল্যাবোরেটরিতে কাজ করবার জন্য। এসময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র জ্ঞান ঘোষ ও মেঘনাদ সাহাকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, আমার ইচ্ছে যে তোমরা উভয়েই বার্লিনে কিছুকাল অবস্থিতি কর। এ প্রকার মনীষীগণের সংস্পর্শে আর জীবনে কখনো আসতে পারবে না। এখানে তিনি প্রায় একটি বছর কাটিয়েছিলেন ও তাঁর উদ্ভাবিত তত্ত্বের যাথার্থ্য বিষয়ে পরীক্ষা করেন। এই কাজে তিনি অধ্যাপক নার্নস্ট ও তাঁর সহকর্মীদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছিলেন। পরীক্ষার ফলাফল খুবই আশাপ্রদ হয়েছিল, কিন্তু তা চূড়ান্ত বলে স্বীকৃত হয়নি। ঠিক এই সময়েই মেঘনাদ কলকাতা থেকে একটি

জরুরী তারবার্তা পেলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সাহাকে পদার্থবিদ্যার খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত করে ঐ তারবার্তাটি পাঠিয়েছিলেন। কাজেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা স্থগিত থাকল এবং দশ বছরের আগে আর তিনি এক্সপেরিমেণ্ট করার সুযোগ পাননি। পরীক্ষালব্ধ প্রাথমিক ফল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জার্নাল অব সায়েন্স'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

তিনি যখন বার্লিনে ছিলেন তখন মেঘনাদ একটি মুহূর্তও বৃথা যেতে দেননি। ল্যাবোরেটরিতে কাজ করার পর যখনি সময় পেতেন তিনি পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনা-চক্রে যোগদান করতেন। এখানে বার্লিনের বহু পদার্থবিজ্ঞানী যোগদান করতেন ও নানা বিষয়ের আলোচনা হতো। এইখানেই তিনি প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন, রুবেনস, এগার্ট প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হন। এইখানে থাকতেই মেঘনাদ মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আর্নল্ড সোমারফিল্ডের কাছে 'On a Physical Theory of Stellar Spectra' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন।

সাহার গবেষণার মৌলিকতার তিনি খুব প্রশংসা করলেন ও এই বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। এই সম্মান তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি মিউনিকে এলেন ও এইখানে তাঁর বক্তৃতা জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়ে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহার জীবনে তাঁর মিউনিক আগমন স্মরণীয় হয়ে আছে একটি বিশেষ ঘটনার জন্য। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তখন মিউনিক দর্শনে এসেছেন। এখানে তিনি বিপুলভাবে সংবর্ধিত হয়েছিলেন। অধ্যাপক সোমারফিল্ড কবিকে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে প্রসঙ্গক্রমে মেঘনাদ সাহার কাজের উচ্চ প্রশংসা করেন। কবি যে হোটেলে অবস্থান করছিলেন সাহা সেইখানে এসে কবিকে প্রণাম করে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালেন। কবি আগে এই তরুণ বিজ্ঞানীর কথা শোনেন নি, অথবা শুনলেও তাঁকে জানতেন না। এখন আলাপ

করে খুব খুশি হলেন ও শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। কবির সম্পর্কে মেঘনাদের কী অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে প্রদত্ত অকপট শ্রদ্ধাঞ্জলিতে।

১৯২০ সালে সূর্যের বহির্ভাগের গ্যাসীয় স্তরের (chromosphere) বর্ণালি সম্পর্কে সাহা যে থিওরি দিয়েছিলেন সেটি যে অভ্রান্ত ছিল তার চূড়ান্ত প্রমাণ তিনি স্বচক্ষে সন্দর্শন করে সন্তুষ্ট হন যখন ১৯২১ সালে তিনি ওসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডেগার্ডের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। এটি ছিল সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত অভিযান; ঐ বছর পূর্ণগ্রাস ছিল।

১৯২১। অক্সফোর্ডে এম্পায়ার ইউনিভারসিটিজ কনফারেন্স বসল। সাহা ঐ কনফারেন্সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করলেন। এই সময়ে তিনি কেম্ব্রিজ পরিদর্শন করেন ও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আর্থার এডিংটন কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে তাঁর ভবনে এসে আলাপ করার দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এইখানেই তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানী চার্লস ডারুইনের পৌত্র সি. জি. ডারুইনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

য়ুরোপ থেকে ফিরে ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে মেঘনাদ বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করলেন। অনেক আশা নিয়েই তিনি যোগদান করেছিলেন, কিন্তু না পেলেন মনের মতো একটি ল্যাবোরেটরি, না পেলেন একজন সহকারী। বছরখানিক পরে তিনি দেখলেন যে একটি ল্যাবোরেটরি গড়ে তোলার সম্ভাবনাও নেই, কারণ সেই সময়ে স্যর আশুতোষের সঙ্গে ভারত সরকারের এমন সংঘর্ষ চলছিল যার ফলে বিজ্ঞান কলেজের কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে উঠেছিল। তখন মেঘনাদ বাইরে কাজের চেষ্টা দেখতে লাগলেন। আমন্ত্রণ এলো আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, আমন্ত্রণ এলো কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর মতো একজন বিজ্ঞানীকে অধ্যাপক হিসাবে পাওয়ার আগ্রহ অনেক শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানেরই ছিল। কিন্তু অনেক বিবেচনা করে মেঘনাদ অবশেষে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু ডক্টর নীলরতন ধর এর দু'বছর আগে এখানে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেছেন ও গবেষণার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভারতবর্ষে যতগুলি মানমন্দির বা observatory আছে তার ডিরেক্টর জেনারেল স্যর গিলবার্ট ওয়াকারের দৃষ্টি ছিল সাহার কাজের ওপর—বিশেষ করে জ্যোতিষ্ক সংক্রান্ত তাঁর মৌলিক গবেষণার ওপর। তাই তিনি মেঘনাদকে কোডাইকানাল সোলার অবজারভেটরির সহকারী ডিরেক্টরের পদে নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তখন এই মানমন্দিরটির ডিরেক্টর ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর এভারসেড। তাঁর মতো একজন প্রতিভাবান লোকের অধীনে কাজ করা খুবই গৌরবের বিষয় ছিল এবং হয়ত ঐ পদ গ্রহণ করলে সাহার ভবিষ্যত খুব ভালো হতে পারত, কিন্তু তাঁর মন-প্রাণ তখন পদার্থবিদ্যার প্রতি নিবদ্ধ হয়েছে এবং অন্য কিছুর সঙ্গে তিনি এর বিনিময় করতে রাজী হলেন না। যদিও প্রথম জীবনে তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ফলিত গণিত ও গ্রহ-নক্ষত্রের গঠন উপাদান ইত্যাদি (Astrophysics) তথাপি এখন তিনি তাঁর প্রতিভার সবটাই নিয়োগ করলেন পদার্থবিজ্ঞানে।

১৯২২ থেকে ১৯৩৮—মেঘনাদ এই ষোল বছর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এটাই ছিল তাঁর কর্মজীবনের স্বর্ণযুগ। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের ফলে ভারতবর্ষের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তর সাধিত হচ্ছিল। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সেই পরিবর্তনের মুখে এক নব কলেবর ধারণ করেছিল এবং এখানে স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়। উত্তর প্রদেশে তখন নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি হয়েছে, তবু এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশ থেকে

ছাত্রদের আকর্ষণ করত। তার প্রধান কারণ তখন এখানে গবেষণার পরিবেশ গড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে।

অবশ্য গোড়ার দিকে এটা ছিল না। এখানে যোগদান করার পর মেঘনাদ কলকাতার সঙ্গে এলাহাবাদের পার্থক্যটা উপলব্ধি করলেন। তিনি দেখেছেন কলকাতার পরিবেশ গবেষণা সমৃদ্ধ, আর এখানে তার নাম গন্ধ নেই। মেঘনাদ এখানে এসে দেখলেন যে পদার্থবিদ্যার বিভাগটিতে মাত্র একজন রীডার, একজন লেকচারার, একজন স্বল্প-সময়ের জন্য লেকচারার ও তুজন ডিমনস্ট্রেটরের মধ্যে একজন তো কেরানীর কাজ করত। ক্লাসে ছাত্রদের পড়াতেই সময় চলে যেত—গবেষণার কথা কেউ বড় একটা বলত না। 'এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কয়েক বছর আমার যেন নির্জন দ্বীপে রবিনসন ক্রুসোর অবস্থা হয়েছিল।' এই কথা বলতেন ডক্টর সাহা।

না একটি ভাল ল্যাবোরেটরি, না একটি ভালো লাইব্রেরী—এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে সেদিন মেঘনাদকে যে পরিশ্রম করতে হয়েছিল তা একমাত্র তাঁর মতো কর্মঠ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এখানে গবেষণার উপযুক্ত একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে তাঁকে সেদিন অসাধ্যসাধন করতে হয়েছিল। ১৯২৭ সালে যখন সাহা ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সদস্য (F. R. S.) নির্বাচিত হলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি পেল। উত্তর প্রদেশের গভর্নর পদে তখন ছিলেন স্যার উইলিয়ম মরিস। ইনি সুপণ্ডিত ও নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ইংরেজ পদার্থবিদ লর্ড রাদারফোর্ডের সহপাঠী ছিলেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক এস. আর. এস. হয়েছেন শুনে তিনি তাঁকে অভিনন্দিত করে একটি চিঠি পাঠালেন।

মেঘনাদ এই সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি একটি চিঠি লিখে গভর্নরকে ল্যাবোরেটরির দৈন্য দশার কথা খুলে বললেন এবং

গবেষণার উপযোগী পরিবেশ যাতে সৃষ্টি হয় সেই মত সাহায্য করতে অনুরোধ জানালেন। অনুরোধ বৃথা হলো না। গভর্ণর রিসার্চের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেন। আজকের দিনে এই টাকা খুব বেশি বলে মনে হবে না। কিন্তু তখনকার দিনে এই পাঁচ হাজারের মূল্য অনেক ছিল। ১৯৩১ সালে তাঁরই অনুরোধক্রমে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কাজের উন্নতির জন্য দেড় হাজার পাউণ্ড দান করেন। ক্রমে অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং উত্তর ভারতের নানা জায়গা থেকে প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন একদল তরুণ গবেষক তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হতে থাকেন। তখনো পর্যন্ত এখানে কোন স্কলারশিপের ব্যবস্থা ছিল না বলে গবেষকরা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তেমনভাবে আকৃষ্ট হতেন না। যাঁরা হয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের অধ্যাপককে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

আরো একটি অসুবিধা ছিল। ক্লাস নিতে হতো খুব বেশি —বি. এস-সি থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত। তাই সে-সময় গবেষণা কাজের কোন অবকাশ ছিল না। গরমের ছুটিতে এই কাজ করতে হতো। আর এলাহাবাদের গরম কি দুঃসহ তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। এপ্রিলের মাঝামাঝি গরমের ছুটি আরম্ভ হতো আর তখন থেকে কলেজ পুনরায় না খোলা পর্যন্ত সাহা এলাহাবাদে অবস্থান করে তাঁর অনুরক্ত কর্মীদের নিয়ে গবেষণার কাজ চালাতেন। এই সময়ে শিক্ষক হিসাবে তিনি প্রতিটি তরুণ গবেষককে এডিসনের[১] একটি উক্তি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলতেন: 'Success in research is only two per cent inspiration and ninety eight per cent perspiraton.' আরো বলতেন, পরীক্ষায় ভাল নম্বর পেলেই গবেষক হওয়া যায় না।

১। টমাস আলভা এডিসন (১৮৪৭-১৯৩১): আমেরিকার তড়িৎবিজ্ঞানী যন্ত্র বিশারদ এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যাদুকর। টেলিগ্রাফের আবিষ্কারক।

শিক্ষক হিসাবে তিনি এখানে যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তা এককথায় অতুলনীয় ছিল। গবেষণার কাজে রত থাকলেও মেঘনাদ শিক্ষাদানে কোন শৈথিল্য প্রকাশ করতেন না—বি. এস-সি ফার্স্ট ইয়ার থেকে এম. এস-সি ফাইনাল—সব ক্লাস তিনি নিতেন। আবার টিউটোরিয়াল ক্লাসও গড়ে তুলেছিলেন। তিনি শিক্ষাদানের মানকে এমন উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর সকল ছাত্রই সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উচ্চস্থান লাভ করতেন। ছাত্রের গৌরবে শিক্ষকের গৌরব—আচার্য মেঘনাদ সাহা এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। এইভাবেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকালে তিনি পদার্থবিদ্যার এক প্রতিভাবান গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর এই গুণেই সর্বজনপ্রিয় শিক্ষকরূপে তিনি সম্পূজিত হয়েছিলেন।

বলেছি তাঁর এলাহাবাদের জীবন মেঘনাদের জীবনের স্বর্ণযুগ এবং তাঁর সৃজনী প্রতিভারও এটা ছিল স্বর্ণযুগ। জীবনে তিনি যত খ্যাতি লাভ করেছিলেন তার প্রত্যেকটাই ছিল এই সময়কার ঘটনা। ১৯২৫ সালে তিনি নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের পদার্থ-বিজ্ঞান ও গণিত বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন; এর দু' বছর পরেই তিনি রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন[১]। তারপর ১৯৩৪ সালে তিনি নিখিল ভারত বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। যে কোন ভারতীয় বিজ্ঞানীর পক্ষে এই সম্মান ছিল আকাঙ্ক্ষিত। সভাপতির অভিভাষণে তিনি সর্বপ্রথম নদী উপত্যকা উন্নয়নের কথা বলেন ও ভারতবর্ষে ঔদক গবেষণা সংক্রান্ত একটি বীক্ষণাগার (hydraulic research laboratory) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। নদী সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিল জন্মাবধি। তিনি বলতেন, আমরা নদীর দেশের মানুষ—আমরা

১। তাপীয় আয়নীকরণের কাজের স্বীকৃতি হিসাবে রয়াল সোসাইটি সাহাকে এই সম্মানে ভূষিত করেন।

তাই আগে সাঁতার শিখি, পরে হাঁটতে শিখি। নদী-বিজ্ঞানে তাঁর দানের কথা পরে বলছি।

এলাহাবাদে তাঁর অক্ষয় কীর্তি হলো উত্তর প্রদেশ আকাদেমি অব সায়েন্স যার নাম বদলিয়ে পরে রাখা হয় দি ন্যাশনাল আকাদেমি অব সায়েন্স। আকাদেমির উদ্বোধন হয় ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ। মেঘনাদ এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। স্যার ম্যালকম হেলি তখন পাঞ্জাবের গভর্নর। তিনি এই ব্যাপারে খুব আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং মেঘনাদের অনুরোধক্রমে তিনি এই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানটিকে বার্ষিক চার হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯৩৮ সালে আকাদেমির উদ্যোগে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা সম্পর্কে যে স্মরণীয় আলোচনা সভা হয়, তাতে সাহার আমন্ত্রণক্রমে জাতীয় নেতা জওহরলাল নেহরু পৌরোহিত্য করেছিলেন।

এলাহাবাদে তাঁর কর্মের পরিধি বহুদূর বিস্তৃত ছিল। তাঁর সময়ে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি য়ুরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল এবং সম্ভবত এই কারণেই এলাহাবাদের একজন বিশিষ্ট নাগরিক ও জননেতা তখন থেকে সাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। য়ুরোপেব আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একাধিক বিজ্ঞানী তাঁরই আমন্ত্রণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা করে গিয়েছেন। জার্মানির প্রখ্যাত তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক আর্নল্ড সোমারফিল্ড ১৯২৯ সালে যখন এখানে আসেন তখন তিনি অধ্যাপক সাহার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যর আর্থার এডিংটনও একবার এখানে বক্তৃতা দিতে এসে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২৭ সালে ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণক্রমে মেঘনাদ ভারতবর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে কোমো শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক

পদার্থবিজ্ঞানীদের সম্মেলনে যোগদান করেন। ভোলটার[১] মৃত্যুর শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। সেই সময় তিনি পৃথিবীর বহু প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানীর সংস্পর্শে এসেছিলেন। এর বিবরণ তিনি ঐ সময়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। ১৯৩৫ সালে তাঁর উদ্যোগে স্থাপিত হয় 'ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স ও ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন।' এই সমিতির মুখপত্র হিসাবে ১৯৩৫ সালে মেঘনাদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'সায়েন্স য়্যাণ্ড কালচার' নামে একটি পত্রিকা। ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক চিন্তা-ভাবনার প্রচারে এই পত্রিকার অবদান অসামান্য। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা তিনি সুভাষচন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য য়ুরোপে অবস্থান করছিলেন। এই রকম একটি মূল্যবান পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য তিনি সাহাকে অভিনন্দিত করেছিলেন। এই পত্রিকায় মেঘনাদ সাহার বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ের প্রবন্ধ সম্ভারে 'সায়েন্স য়্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যা পূর্ণ থাকত।

পত্রিকাটির প্রথম দিকে অধ্যাপক সাহা কিছুদিন কলকাতায় ছিলেন না। তখন পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক চিঠিতে (4.11.35) মেঘনাদ সাহাকে লিখেছিলেন, ··· Science and culture বড় উপাদেয় হইয়াছে। Article গুলি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ কর্তৃক লিখিত হইয়াছে; কিন্তু এর issue দেখিয়া যুগপৎ হরিষ ও বিষাদের উদয় হইল। ইহা··· একমাত্র তোমারই উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রসূত।··· আমাদের বাঙ্গালীর জাতিগত দোষ এই যে কোন বিশেষ কারণ ঘটিলে কিছু-

---

১। কাউন্ট অ্যালসান্দ্রো ভোলটা (১৭৪৫—১৮২৭)। চলবিদ্যুতের ব্যাটারি আবিষ্কারক ইতালীয় পদার্থবিজ্ঞানী। তড়িৎবিজ্ঞানে (Electricity) এঁর অবদান অসামান্য।

দিনের জন্য জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ হয়, কিন্তু আবার অহিফেনসেবীর ন্যায় ঝিমাইতে থাকে এবং ঘুমাইয়া পড়ে। এমন কি আমার ভয় হইতেছে যে তোমার বিদেশে অবস্থিতিকালে journal-এর অস্তিত্ব বিলোপ না হইলেও Quality deteriorate করিবে।...

১৯৩৬ সাল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কার্নেগিট্রাস্ট সাহাকে বাইরে যাওয়ার জন্য একটি ফেলোশিপ প্রদান করেন। এই সম্মান লাভও তাঁর পক্ষে গৌরবজনক ছিল। ফেলোশিপের টাকায় তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এবারের য়ুরোপ ভ্রমণের তালিকায় প্রথমে ছিল মিউনিক। অধ্যাপক সোমারফিল্ডের আমন্ত্রণে তিনি এখানেও স্থানীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান (ডয়েটসে অকাদেমি) কর্তৃক বিপুলভাবে সংবর্ধিত হন। মিউনিক থেকে লণ্ডনে এসে স্থানীয় ফিজিক্যাল সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক এই উৎসবে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্ল্যাঙ্ক তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়ার বিশেষ প্রয়োজন।' তাঁর এই কথাটি মেঘনাদের খুব ভাল লেগেছিল।

য়ুরোপ থেকে আমেরিকায় এসে তিনি হার্ভার্ড কলেজের অতিথি হিসাবে এখানে দুমাস অবস্থান করেন ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিশত বার্ষিক উৎসবে যোগদান করেন। এখানকার আরো কয়েকটি মানমন্দির তিনি পরিদর্শন করেন। সান ফ্রানসিস্‌কোতে অধ্যাপক লরেন্সের বিখ্যাত সাইক্লোট্রোন[১] ল্যাবোরেটরি পরিদর্শন করেন। ১৯২৭ সালে বার্লিন ও কোপেনহেগেনে সাহা এঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার অগ্রগতি দেখে তিনি খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বদেশে ঠিক এইরকম অগ্রগতি কবে হবে তা চিন্তা করতেন। বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ ভিন্ন

১। উচ্চ শক্তিশালী বিভিন্ন তড়িৎ-কণিকা উৎপাদনের জন্য উদ্ভাবিত জটিল যন্ত্রের নাম সাইক্লোট্রোন (cyclotrone)

কোন দেশ বা জাতির বৈষয়িক উন্নতি লাভ যে আদৌ সম্ভব নয়—এইটি তখন তাঁর চিন্তার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনের পর সাহা আবার য়ুরোপে ফিরলেন ও কোপেন-হেগেনে অনুষ্ঠিত নিউক্লিয়ার ফিজিক্স[২]-এর আন্তর্জাতিক সম্মিলনীতে যোগদান করেন। এই সময় তিনি এখানে এক পক্ষকাল অবস্থান করেছিলেন। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করার পর থেকেই তিনি এই বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। ভবিষ্যতের পদার্থবিজ্ঞানের উন্নতি যে এই পথে—এই সুনিশ্চিত ধারণা নিয়ে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

২। Nuclear Physics—পদার্থবিজ্ঞানের যে শাখায় পরমাণুর ভেতরের নিউক্লিয়াসের গঠন ও বিভিন্ন সংগঠক কণিকা সম্বন্ধীয় বিশেষ তথ্যাদির পরীক্ষা ও গবেষণাদি করা হয়। অর্থাৎ পরমাণুর কেন্দ্রীণের গঠন সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। Nucleus (নিউক্লিয়াস)—কেন্দ্রীয় বস্তু বা কেন্দ্রীণ পদার্থ; মৌলিক পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ধন তড়িৎ বিশিষ্ট মূল বস্তু-কণিকা।

॥ পাঁচ ॥

১৯৩৮। জুলাই মাস।

মেঘনাদ সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করলেন পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক হিসাবে। আগের চেয়ে আরো খ্যাতিমান হয়ে তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন তাঁর পুরাতন এবং প্রথম কর্মস্থলে। এর ঠিক সাত বছর পরে মেঘনাদের বন্ধু সত্যেন বোস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পদ থেকে অবসর নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন ও বিজ্ঞান কলেজে ঐ বিষয়ের খয়রা অধ্যাপক নিযুক্ত হন। দুই বন্ধুই তখন বিশ্ব-বিশ্রুত বিজ্ঞানী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৯২৩ সালে মেঘনাদ যখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন তখন তাঁর খ্যাতির পরিমণ্ডল সীমিত ছিল; ১৯৩৮ সালে বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। তাই মহানগরী তাঁকে স্বাগত জানাল।

বাংলা তাঁর জন্মস্থান। তাঁর কর্মের পরিধি এখন আরো বিস্তৃতি লাভ করলো এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত বহুবিধ কাজের সঙ্গে সাহা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন। ১৯৩৮ থেকে তাঁর মৃত্যুর বৎসর (১৯৫৬) —এই আঠারো বছর আমরা তাঁকে দেশের হিতকর বহুবিধ কর্মে নিয়োজিত

থাকতে দেখি এবং এই সময় তিনি দেশের রাজনীতির প্রতিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুত অধ্যাপক সাহার জীবনের শেষ আঠারো বছর ছিল আরো গৌরবময়। তাঁর জীবনের সেই নিরলস অধ্যায়ের কথা আমরা এইবার আলোচনা করব।

পালিত অধ্যাপক হিসাবে বিজ্ঞান কলেজে তাঁর বিভাগটির উন্নয়ন সাধন ছিল অধ্যাপক সাহার প্রথম কাজ। তাঁর আগে এই পদে যে দু'জন ছিলেন—রমন ও ডি. এম. বসু—তাঁদের কেউই পালিত ল্যাবোরেটরির পুনর্বিন্যাস ও উন্নতি বিধানে মন দিতে পারেন নি। বিশেষ করে অধ্যাপক রমনকে তখন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সেরও কাজকর্ম দেখতে হতো। সাহা যখন এলেন তখন বিভাগটি কি পঠন-পাঠন, কি গবেষণা কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্মোদ্যম ও আগ্রহ নিয়ে মেঘনাদ তাঁর কাজে অগ্রসর হলেন।

এই সময়ে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞানের ঘোষ অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত ছিলেন মেঘনাদের সতীর্থ অধ্যাপক এস. কে. মিত্র। তিনিই সকলের আগে তাঁর বন্ধুকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানালেন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসার জন্য। অধ্যাপক বসু ১৯৩৪ সালে বিজ্ঞান কলেজে প্রথম আয়নোস্ফেরিক ল্যাবোরেটরি গড়ে তোলেন এবং এই বিষয়ে তিনি একদল উৎসাহী কর্মী তৈরি করে নিয়েছিলেন। তাঁর অধীনে কাজ করে এঁরা এই বিষয়ে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলেন। এলাহাবাদে থাকতে সাহা এই বিষয়টির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি তাঁর কর্মের ধারা পরিবর্তন করলেন।

তিনি বেছে নিলেন নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। তখন এই বিষয়টি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, এখন যেমন করেছে। সেই যে ১৯৩৬ সালে মেঘনাদ কোপেনহেগেনে গিয়ে অধ্যাপক লরেন্সের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবোরেটরি সন্দর্শন করেন ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন তখন থেকেই তিনি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এর

অপরিসীম সম্ভাবনা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৩৯ সালে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী ওটো হ্যান (Otto Hahn) পরমাণু বিজ্ঞানের[১] প্রক্রিয়া অর্থাৎ Nuclear fission[২] উদ্ভাবন করলেন তখন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে তাঁর নিজস্ব 'সায়েন্স য়্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখলেন। ভারতবর্ষে এই বিষয়ে এইটি ছিল প্রথম প্রবন্ধ এবং সম্ভবত সমগ্র পৃথিবীতে পারমাণবিক শক্তির (atomic energy) ব্যবহার সম্পর্কে এইটি ছিল অন্যতম প্রথম আলোচনা।

বিজ্ঞান কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একটি নতুন বীক্ষণাগার —নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবোরেটরি গড়ে তুলবেন ঠিক করলেন মেঘনাদ। কিন্তু এই জাতীয় একটি বীক্ষণাগার গড়ে তুলতে যে পরিমাণ টাকার দরকার তা পাওয়া বড়ো সহজ ছিল না। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আমল থেকে এই দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অনুদানের পরিমাণ যে কী যৎসামান্য সে ইতিহাস তাঁর জানা ছিল। এককালীন অনুদান কখনো লাখের ওপরে যেত না আর নিয়মিত দানের পরিমাণ তো হাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত।

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স কি রকম ব্যয়বহুল ব্যাপার সাহা তা জানতেন। তিনি আরো জানতেন যে এই রকম একটি ল্যাবোরেটরি স্থাপন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে টাকার কথা বলা অথবা প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে আবেদন

১। তড়িতাবিষ্ট পরমাণু বা পরমাণুসমষ্টিকে আয়ন (ION) বল হয়। ভূপৃষ্ঠের মোটামুটি ২০০ থেকে ২৫০ মাইল উচ্চে অবস্থিত আয়নান্বিত বায়বীয় স্তরকে আয়নোস্ফিয়ার (IONOSPHERE) বলা হয়।

২। ইউরেনিয়াম প্রভৃতি ভারি ধাতুর পরমাণুগুলোকে বিভিন্ন শক্তি কণিকায় বিশ্লিষ্ট করার আগে ভেঙে ফেলার প্রক্রিয়ার নাম নিউক্লিয়ার ফিসন—পরমাণু বিভাজন বা পরমাণু ভাঙা। Atom—পরমাণু; Energy—শক্তি; Atomic energy—পারমাণবিক শক্তি।

করা যে বৃথা হবে, তা তিনি জানতেন। বিশ্ববিদ্যালয় তো টাকার অঙ্ক শুনে আতঙ্কে শিউরে উঠবে, তাছাড়া সিণ্ডিকেটের তহবিলে এরকম একটি ল্যাবোরেটরি গড়ে তোলার মতো টাকাই বা কোথায়? তখন তিনি একটা মধ্যপন্থা বেছে নিলেন, কিন্তু তার ফলে তাঁকে যথেষ্ট অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, কারণ যে পরিমাণ টাকা নিয়ে নিজে এই কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন তা নিতান্তই যৎসামান্য ছিল। এই প্রসঙ্গে মেঘনাদ বলেছেন: 'লোকে চায় তাড়াতাড়ি ফল, এবং যখন সেটা পাওয়া যায় না তখন তারা নিরাশ হয়। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল—লোকে আমার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে ভীষণভাবে সন্দেহ করতে আরম্ভ করলো। অনেকে আমাকে পাগল বলেও উপহাস করেছিল। উচ্চ মহলে এইগুলি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।' নানা অসুবিধের মধ্যেই তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের পাঠক্রম চালু করেন।

তথাপি ডক্টর মেঘনাদ সাহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও এই মহানগরীতে একদিন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল। ১৯৩৯ ও ১৯৪১ সালে তিনি যখন জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির (ন্যাশনাল প্লানিং কমিটি) কাজে বোম্বাইতে ছিলেন তখন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান নেহরুর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই সুযোগ তিনি তাঁর অভীষ্ট সাধনে ব্যবহার করলেন। পারমাণবিক শক্তির অকল্পিত সম্ভাবনার কথা তিনি নেহরুকে যখন বুঝিয়ে বললেন তখন বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করতে নেহরুর বিলম্ব হলো না। তাঁর কাছেই অর্থ সাহায্যের কথাটা মেঘনাদ তুলেছিলেন। নেহরু অনুরোধ করলেন টাটা কোম্পানীর কর্ণধার জে. আর. ডি. টাটাকে এই ব্যাপারে কিছু টাকা দেওয়ার জন্য। টাটা কোম্পানীর পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এলো যাট হাজার টাকা। বিজ্ঞান কলেজে একটি সাইক্লোট্রোন যন্ত্র বসাবার জন্য এই টাকা দেওয়া হয়।

অনেক চিন্তা-ভাবনার পর বিশ্ববিদ্যালয় এই দান গ্রহণে সম্মত হন এবং তখন বিজ্ঞান কলেজের পদার্থবিভাগের পালিত অধ্যাপককে তাঁর সংকল্পিত কাজে অগ্রসর হবার জন্য অনুরোধ করা হয়। টাটার কাছ থেকে এই টাকা পাওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকার কিছু অর্থ সাহায্য করলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির জন্য অর্ডার দেওয়া হলো। যন্ত্রপাতি কিছু এসে পৌঁছল ; কিছু কিছু জিনিস (যেমন ডিফিউশন পাম্প) বিজ্ঞান কলেজের কারখানায় (workshop) তৈরি করিয়ে নেওয়া হলো। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, মেঘনাদ যখন এই ল্যাবোরেটরি স্থাপনের কাজে হাত দেন তখন তাঁরই একটি ছাত্রকে এই কাজের উপযোগী করে তৈরি করে নিয়েছিলেন। এঁর নাম কমলেশ রায়। বিজ্ঞান কলেজে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ল্যাবোরেটরি স্থাপন, সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি কাজে ইনিই ছিলেন সাহার যোগ্যতম সহকারী। এইভাবে অগ্রসর হওয়ার পর ১৯৪৪ সালে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। কারণ কারখানায় তৈরী পাম্প ইত্যাদি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই ছোট ছিল।

১৯৪৪ সালটি অধ্যাপক সাহার জীবনে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে ; ঐ বছরে ভারতবর্ষ থেকে বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত একটি সদিচ্ছা জ্ঞাপক প্রতিনিধিদল (a scientific goodwill mission) য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাঠানো হয়। এই প্রতিনিধিদলের প্রধান ছিলেন মেঘনাদ সাহা এবং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে আমেরিকা কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করা-ই ছিল এই মিশনের উদ্দেশ্য। গুরুত্বপূর্ণ এই মিশনের নেতৃত্ব করতে গিয়ে আমেরিকায় অধ্যাপক সাহাকে কি রকম বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে তিনি নিজে বলেছেন :

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে আইনস্টাইন প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মার্কিন সরকারের আশ্রয় নিয়েছিলেন। প্রধানত এঁদেরই সহযোগিতায় মার্কিন সরকার তখন পরমাণু বোমা (atom

bomb) তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন। কাজটা ছিল অত্যন্ত গোপনীয় এবং যে সব লোক এই কাজে তখন নিযুক্ত ছিলেন মার্কিন সরকারের আদেশে তাঁদের কেউই এ বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে বা আলোচনা করতে পারতেন না। এই নিষেধ অমান্য করার কারো সাহস ছিল না। সমস্ত বিষয়টির ওপর যেন একটা দুর্ভেদ্য গোপনীয়তার আবরণ দেওয়া হয়েছিল। সেই আবরণ ভেদ করে বহিরাগত কারো পক্ষে কোন তথ্য সংগ্রহ করা কঠিন ছিল। আমাদের আগে এবিষয়ে সাবধান করে দেওয়া হয়নি। ওদেশের নিরাপত্তা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি আমাদের ওপর ছিল। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক শক্তির ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হয়েছে সেই সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারিনি।'

তারপর যুদ্ধ মিটে গেল। সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নির্মাণের উপযোগী তথ্য, যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য সাহা বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। ইতিমধ্যে হিরোসিমা ও নাগাসিকি নামক দুটি জাপানী শহরের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের আদেশে দুটি আণবিক বোমা ফেলা হয়। ধ্বংসের একটি নতুন অস্ত্রের আবির্ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। যে জিনিস করতে আমেরিকার লাগত পঞ্চাশ বছর তা বহিরাগত বিজ্ঞানীদের সাহায্যে সম্ভব হয় মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে। এজন্য মার্কিন সরকার খরচ করেছিলেন দু'হাজার বিলিয়ন ডলার।

১৯৪৭ সালে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে সাহা প্যারিসে গেলেন। ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী রাদারফোর্ড সম্পর্কে প্যারিসে আন্তর্জাতিক স্মরণসভা হয়, তাতে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে ঐ দেশ থেকে তিনি পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে, ভারত সরকার একটি পারমাণবিক শক্তি কমিশন (Atomic Energy Commission)

গঠনের কথা চিন্তা করেন ও এই বিষয়ে সাহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হয়। কারণ তখন ভারতবর্ষে এই বিষয়ে তিনিই ছিলেন একমাত্র ওয়াকিবহাল মানুষ। তিনি দুটি যুক্তি প্রদর্শন করে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথম, আগে দেশে শিল্পের উন্নতি সাধন না করে একাজে হাত দেওয়া উচিত হবে না। দ্বিতীয়, আগে এই কাজের উপযুক্ত কর্মী তৈরি করা দরকার। তিনি এই বিষয়ে ভারত সরকারকে একটি পরিকল্পনাও দেন, কিন্তু সেটি অগ্রাহ্য করে ১৯৪৯ সালে ভারতে পারমাণবিক শক্তি কমিশন গঠিত হয়। ডক্টর এইচ. জে. ভাবা কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন ও সাহার বন্ধু ডক্টর ভাটনগর সেক্রেটারি ও সদস্য নিযুক্ত হন।

এই সংস্থা গঠিত হওয়ার ফলে সাহাকে দারুণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। ইনস্টিট্যুট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স স্থাপিত হয়েছিল দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে ; যথা, প্রথম—এই কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মী তৈরি করা আর এই বিষয়ে প্রকৃত গবেষণা চালিয়ে যাওয়া। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এই দেশে একশো জনের বেশি অভিজ্ঞ কর্মী ছিল কিনা সন্দেহ, অথচ কমিশনের কাজ ঠিকভাবে চালাবার পক্ষে এর পাঁচগুণ কর্মী দরকার। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য ছিল : এই কাজের উপযোগী ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি জিনিসগুলি দেশে কোথায় পাওয়া যায় তার সন্ধান করা এবং ব্যাপক গবেষণার কাজ চালিয়ে যাওয়া।

তখনো পর্যন্ত ইনস্টিট্যুট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনাধীনে ছিল এবং এইজন্য এর কাজে তেমন অগ্রগতি দেখা যেত না। কেন্দ্রীয় সরকার থেকেও অর্থ সাহায্য পাওয়া কঠিন ছিল। অথচ সাহা তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও উদ্যম নিয়ে এই কাছে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারত সরকারের মধ্যে বহু

আলোচনার পর ইনস্টিট্যুট যখন একটি সর্বভারতীয় স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয় তখন থেকে এর কর্মের প্রসার হতে থাকে ও সাহার এতকালের স্বপ্ন চরিতার্থ হয়। পালিত ল্যাবোরেটরিতে সামান্য ভাবে যার সূচনা হয়েছিল আজ তা একটি পরিণত রূপ লাভ করে এর প্রতিষ্ঠাতার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় বহন করছে। নিঃসন্দেহে এ তাঁর কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি-স্তম্ভ।

॥ ছয় ॥

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স।

দুশো দশ নম্বর বৌবাজার স্ট্রীটের এই প্রতিষ্ঠানটি আধুনিক ভারতবর্ষের প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৬ সালে তাঁরই চেষ্টায় এটি স্থাপিত হয় এবং বাঙালী তথা ভারতবাসীকে বিজ্ঞানচর্চায় উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এদেশে বিজ্ঞান অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রে এই সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই স্মরণীয় হয়ে আছে। মেঘনাদ সাহা তাঁর ছাত্রজীবনে ১৯১৩ সাল থেকে এখানে নিয়মিতভাবে লেকচার শুনতে আসতেন এবং ১৯২৬ সাল থেকে তিনি এর আজীবন সদস্য ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি তাঁর বিশেষ মমতা ছিল। তাই ১৯৩৮ সালে যখন তিনি দ্বিতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান কলেজে ফিরে এলেন তখন থেকে সাহা এই সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হন ও এর কাজকর্ম দেখাশুনা করতে থাকেন।

১৯৪৪ সালে তিনি এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন ও পরে ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৪৬ সালে তিনি এর সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। এবং তখন থেকে এর উন্নতিবিধানে

সচেষ্ট হন। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৩ সাল থেকে মেঘনাদ এই প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে থাকেন এবং এর পুনর্বিন্যাস সাধনে তৎপর হন। এ সময়ে অধ্যাপক সাহার অন্য একটি কাজও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় যাদবপুরে তিনি সরকারের কাছ থেকে দশ একর জমি আদায় করেন। তারপর এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি এটিকে ১৯৫১ সালে যাদবপুরের ভূখণ্ডের ওপর নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করেন। ১৯৫২ সালে তিনি এর ডাইরেক্টর নিযুক্ত হন। সুসজ্জিত ল্যাবোরেটরি, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক পুস্তক এবং পত্র-পত্রিকায় পূর্ণ একটি গ্রন্থাগার—এইসব উন্নতিবিধান সাহার একক চেষ্টার ফলেই সম্ভব হয়েছিল। ভারত সরকার আগে এই প্রতিষ্ঠানকে বছরে অনুদান দিতেন কুড়ি হাজার টাকা; এখন তাঁর চেষ্টায় সেই অনুদানের পরিমাণ বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন মেঘনাদ সাহা। এদেশে বন্যায় প্রতি বছর কত ক্ষয়-ক্ষতি হয়; কত লোক ও গবাদি পশু মারা যায়। তাঁর ছাত্রজীবনে তিনি বন্যার ভয়াবহতা স্বচক্ষে দেখেছিলেন। ১৯১৩ সালে যখন তিনি এম. এস-সি ক্লাসের ছাত্র তখন বর্ধমানে দামোদরের যে প্রবল বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যাত্রাণের কাজে তিনি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করেছিলেন এবং তখন থেকেই এই বিষয়টি তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকে। দামোদর ও দামোদরের বন্যা তখন থেকেই তাঁর চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। সেই চিন্তা-ভাবনা তাঁকে এদেশে বন্যার বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভারতবর্ষে নদী-বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা চলে।

প্রথমবার যখন তিনি য়ুরোপ থেকে ফিরলেন তখন উত্তরবঙ্গে ভীষণ বন্যা দেখা দিয়েছে। ১৯২২ সালের পূজার সময় উত্তরবঙ্গের বন্যায় রাজসাহী, পাবনা ও বগুড়া জেলার গ্রামগুলি একেবারে ডুবে

গিয়েছিল। লোকের ঘর-বাড়ি, গরু-বাছুর, শস্য সব নষ্ট হয়ে
গিয়েছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তখন বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক।
তাঁরই নেতৃত্বে রিলিফের ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞান কলেজে তাঁরই ঘরে
বন্যাত্রাণ সমিতির অফিস বসেছিল। সেদিন তাঁর আহ্বানে যেসব
তরুণ এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু ও আচার্য
রায়ের ছাত্র এবং বিজ্ঞান কলেজের লেকচারার মেঘনাদ সাহার নাম
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মেঘনাদ প্রচারের ভার নিলেন। রিলিফ কমিটির প্রচার সচিব
হিসাবে সাহা এই সময়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় বন্যার কারণ
সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বন্যা
নিবারণের উপায়ের কথাও আলোচনা করেছিলেন। নদী সম্পর্কে
তাঁর গবেষণার এই ছিল সূচনা। ১৯৩২ সালে উত্তর ও পূর্ব-বঙ্গের
কয়েকটি অঞ্চলে আবার ভয়াবহ বন্যা দেখা দিল। এবারও প্রফুল্ল
চন্দ্র বন্যার্তদের সেবাকার্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবারও
বিজ্ঞান কলেজের বাড়িতে সঙ্কটত্রাণ সমিতির অফিস খোলা হয়েছিল।
এই সময় মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২) মেঘনাদ
সাহা 'বাংলার বন্যা ও তাহার প্রতিকারের উপায়' এই শিরোনামায়
তথ্যবহুল একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখে-
ছিলেন, 'এই বন্যায় প্রায় বিশ লক্ষ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং
প্রায় চার লক্ষ গৃহ বিধ্বস্ত হয়েছে। এই বন্যায় বাংলা দেশের আট
কোটি থেকে দশ কোটি পর্যন্ত টাকা ক্ষতি হয়েছে।'

কিন্তু এর চেয়েও মূল্যবান প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন 'আচার্য
প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্মারক গ্রন্থে।' এখানে উল্লেখ্য যে ঐ সময়ে আচার্য
রায়ের সত্তর বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতায় প্রফুল্ল জয়ন্তী অনুষ্ঠান হয়;
রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এই জয়ন্তী উপলক্ষে
তাঁকে দেশবাসীর পক্ষ থেকে যে অভিনন্দন গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়
সেই গ্রন্থে মেঘনাদ সাহা 'Need for Hydraulic Research

Laboratory in Bengal' এই নামে মূল্যবান তথ্যপূর্ণ যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন সেটি সকলের, বিশেষ করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই প্রবন্ধে তিনি বাংলার নদীসমস্যাটি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেন এবং এই সমস্যার সমাধানের জন্য জার্মানী ও আমেরিকার দৃষ্টান্তের অনুসরণে নদী সম্পর্কে গবেষণার জন্য ল্যাবোরেটরি স্থাপনের কথা বলেন। এগার বছর পরে বাংলা সরকার তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন ও কলকাতা থেকে বিশ মাইল উত্তরে হরিণঘাটায় দি বেঙ্গল রিভার রিসার্চ ইনস্টিট্যুট নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রবন্ধের শেষে তিনি লিখেছিলেন: 'বর্তমানে যখন মানুষের দৈনন্দিন সুখ বৃদ্ধির জন্য জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ হচ্ছে, তখন এ খুবই আশ্চার্যের বিষয় যে, নদী-নিয়ন্ত্রণের সমস্যাটি আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আলোচিত হয় নি।'

১৯৩৪ সালে সাহা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতির অভিভাষণে তিনিই সর্বপ্রথম নদী-উপত্যকা উন্নয়নের কথা বলেন ও ভারতবর্ষে এই জন্য একটি ল্যাবোরেটরি (Hydraulic Research Laboratory) স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা আবার বলেন। তেমনি ১৯৩৮ সালে ন্যাশনাল ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্সের তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে ভারতের নদী সমস্যা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে যে চিত্র তুলে ধরেছিলেন তা পাঠ করে এই বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকতা দেখে সবাই বিস্মিত হয়। দামোদরের বন্যার ভয়াবহতা দেখে মেঘনাদই সর্বপ্রথম দামোদর নদী পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৪৩ সালে বাংলা সরকার দামোদরের বন্যা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য যে কমিশন নিয়োগ করেন, মেঘনাদ তার অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঐ বছরেই দামোদরের ভয়াবহ বন্যার সময় তিনি সংবাদ পত্রে যেসব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার ফলেই সরকার থেকে এই কমিশন গঠিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসি নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য T. V. A.

(টেনেসি ভ্যালি অথরিটি) নামে যে সংস্থা গঠিত হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে দামোদর নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব সাহাই প্রথম করেন। এই সময়ে তাঁর সুযোগ্য সহকারী কমলেশ রায়ের সহযোগিতায় লেখা ও 'সায়েন্স য়্যাণ্ড কালচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'প্ল্যানিং ফর দি দামোদর ভ্যালি' প্রবন্ধগুলি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বস্তুত তাঁর এই রচনা-গুলির মধ্যেই আমরা দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন গঠনের বীজ দেখতে পাই। এইভাবে বিজ্ঞানী মেঘনাদ ভারতবর্ষে একটি গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয়ে গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দিয়ে গেছেন।

১৯৩৮ থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি মেঘনাদ তাঁর চার-পাশে যেন কর্মের একটা প্রবল আবর্ত রচনা করেছিলেন। বিজ্ঞান কলেজ, এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ইনস্টিট্যুট অব সায়েন্স—এসব সংস্থা যেমন তাঁর সময় ও শ্রমের ওপর দাবী করত, তেমনি বন্যা সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা ও পরিকল্পনা সমস্যায় তাঁর মস্তিষ্ক সর্বদা আলোড়িত হতো। এর ওপর ছিল লোকসভার নির্বাচিত সদস্যরূপে কাজ। এতগুলি কাজে তিনি একসঙ্গে কিভাবে মন দিতেন তা দেখে সবাই বিস্মিত হয়। ভগবান যেন এই মানুষটিকে একটি প্রচণ্ড কর্মের আধাররূপে সৃষ্টি করে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিলেন। কর্মই ছিল মেঘনাদের জীবনের মূলমন্ত্র; কর্মই ছিল তাঁর জীবনের নিয়ামক।

দেশ বিভাগ হলো ; ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। পূর্ব বাংলা থেকে দলে দলে কলকাতায় আসতে থাকে উদ্বাস্তু নর-নারী। দেশের সামনে একটা নতুন সমস্যা দেখা দিল। বিচলিত হলেন অধ্যাপক সাহা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশ ভাগ হবার পর পূর্ব-বঙ্গের মানুষ এদেশে আসতে শুরু করলে ডঃ সাহা তাদের সমস্যার সমাধানে বিশেষভাবেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঐ সময়ে (১৯৪৭-৪৮) কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা সেবা সমিতি গঠিত হয়েছিল। শ্রীঅখিল দত্ত ঐ সমিতির সভাপতি এবং ডঃ মেঘনাদ সাহা অন্যতম সহঃ সভাপতি

ছিলেন। ২০, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটে ঐ সমিতির কার্যালয় ছিল। ডঃ সাহা মাঝে মাঝে সমিতির কার্যালয়ে আসতেন। খাটো ধুতি পরতেন, পায়ে কালো জুতো, গলাবন্ধ কোট—একেবারে সাদাসিধে পোশাক। উচ্চারণ এবং বাকভঙ্গীতে খাঁটি পূর্ববঙ্গীয়। ডঃ সাহাই বোধ করি সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিকল্পনার কথা বলেছিলেন। প্রায়ই বলতেন—জাতটাকে ভিখারী হতে দেওয়া হবে না। উদ্বাস্তুদের কর্মভিত্তিক পুনর্বাসনের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা রচনা করে তিনি নেহরুর কাছে পাঠিয়েছিলেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। এ তাঁর মানবিক মহত্ত্বেরই পরিচায়ক।

বস্তুত, সেদিন এই উদ্বাস্তু সমস্যাটিকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানী মেঘনাদের চরিত্রের মানবিক দিকটি যেভাবে উদঘাটিত হয়েছিল তা তাঁর জীবনকে একটা নতুন গরিমায় মণ্ডিত করেছিল। এক্ষেত্রে তিনি যেন অনেকটা আইনস্টাইনের সমগোত্র ছিলেন। দুইটি বিশ্বযুদ্ধের পর তাঁর স্বজাতির পুনর্বাসন সমস্যার সমাধানে এই বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠকেও বিচলিত হতে দেখা গিয়েছিল।

সময় ১৯৩৮। স্থান—এলগিন রোড। সকালবেলা।

মেঘনাদ সাহা এলেন সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে। তিনি সে বছর কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকতে দুজনের মধ্যে পরিচয় এবং তারপর ১৯২২ সালের বন্যাত্রাণ কাজে দুজনে দুজনের খুব পরিচিত হন। সুভাষচন্দ্রের জ্বলন্ত দেশপ্রেম মেঘনাদকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জেনে সাহা যারপর নাই আনন্দিত হয়েছিলেন। বিজ্ঞানী হিসাবে ডঃ সাহাকে সুভাষচন্দ্র খুব শ্রদ্ধা করতেন। সেদিন দুজনের মধ্যে এই রকম কথা হয়েছিল।

—আপনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, অভিনন্দন জানাই।

—ধন্যবাদ। বসুন!

—একটা প্রশ্ন করব? কংগ্রেস যখন পূর্ণ ক্ষমতায় আসীন হয়ে শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, তখন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে কি উপায়ে?

—আমরা এতকাল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে এসেছি, একথা চিন্তা করিনি। আপনি কিছু চিন্তা করেছেন?

—বিলক্ষণ। পরিকল্পনা ভিন্ন দেশের দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, শিল্পের উন্নয়ন—কিছুই সম্ভব হবে না।

সুভাষচন্দ্র সেদিন অধ্যাপক সাহার সঙ্গে দু'তিন ঘণ্টা এই বিষয়ে আলোচনা করে বুঝলেন যে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান সম্মতভাবে রচিত পরিকল্পনা ব্যতীত কোন পথ নেই। তিনি জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। তারপর বোম্বাইতে ডঃ সাহা নেহরুর সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তার ফলে নেহরুর মনে এই ধারণা দৃঢ় হলো যে, বর্তমান যুগে পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং ছাড়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেই সময়ে কংগ্রেসের চরখা ও খদ্দরনীতির কঠিন সমালোচনা করে মেঘনাদ বলতেনঃ 'এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে আমরা কি এখনও গরুর গাড়ির যুগে অর্থাৎ কুটীর শিল্পের যুগে বাস করব?' তিনি কংগ্রেসের কুটীর শিল্প নীতির সমর্থক ছিলেন না এবং এই নিয়ে তাঁর শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটেছিল। তবু তিনি তাঁর স্বাধীন চিন্তায় অবিচল ছিলেন।

১৯৩৮ সালে পরিকল্পনার বিষয়টি নিয়ে মেঘনাদ যে রকম চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন তার সকল ইতিহাস বলার স্থান নেই। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তিনি যখন এক পরিকল্পনা রচনা করে নেহরুর হাতে দিলেন সেটি পাঠ করে নেহরু রীতিমত বিস্মিত হন ও বলেনঃ 'ইতিহাসে পরিকল্পনার জনক হিসাবে আপনার

নাম কীর্তিত হবে। এই বিষয় নিয়ে আপনার মতো আর কাউকে এমন চিন্তা করতে দেখিনি।' অতঃপর কংগ্রেসের অধীনে যখন একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয় তখন মেঘনাদের প্রস্তাব-ক্রমে নেহরুকে তার সভাপতি করা হয়। পরিকল্পনার পথে অগ্রসর হয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক দৃষ্টান্ত দেখেই সাহা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর রচনাগুলি আজো তাদের মূল্য হারায়নি। স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ আমরা যে বিস্ময়কর শিল্পোন্নয়ন দেখি, এর পথ তো তিনিই প্রশস্ত করে গিয়েছেন। শুধু এই কারণেই মেঘনাদ সাহা জাতির কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়ে থাকবেন চিরকাল।

১৯৫১ সালের লোকসভা নির্বাচনে মেঘনাদ উত্তর কলকাতা থেকে নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। এটা তাঁর জনপ্রিয়তার পরিচায়ক ছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র থেকে রাজনীতিতে তিনি চলে এলেন। বিজ্ঞানলক্ষ্মীর সাধনায় জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়ে, শেষের পাঁচটি বছর রাজনীতির ঊষর ক্ষেত্রে বিচরণ করা হয়ত দেশের পক্ষে লাভজনক হয়েছিল, কিন্তু বিজ্ঞানের পক্ষে যে ক্ষতিকর হয়েছিল, তাঁর সতীর্থগণের মধ্যে অনেকে এই ধারণা পোষণ করতেন। লোকসভার সদস্য থাকাকালীন সময়ে ১৯৫৬ সালের ১৬ জানুয়ারি রাজধানী দিল্লীতে মাত্র বাষট্টি বছর বয়সে মেঘনাদ সাহার জীবনাবসান ঘটে। বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ ও দেশসেবক হিসাবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তাঁর স্মৃতি যেমন অক্ষয় হয়ে থাকবে, তেমনি তাপীয় আয়নবাদের উদ্ভাবক হিসাবে এবং ভারতে পরমাণু বিজ্ঞানের পথিকৃৎ হিসাবে পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর নাম চির-স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংযোজন

অধ্যাপক সাহার বৈজ্ঞানিক অবদানের সার সংক্ষেপ

অধ্যাপক সাহার গবেষণালব্ধ ফল সাহার তাপীয় আয়নবাদ নামে সুপরিচিত। এই মতবাদের মূল কথাটুকু জানতে হলে উচ্চ তাপমাত্রায় পদার্থের পরিণতি কি হয় তা জানা দরকার। আমরা জানি, তাপমাত্রা বাড়ালে কঠিন পদার্থ তরল হয়, আরো অধিকতর তাপে তরল পদার্থ বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। পদার্থের এই রূপান্তর আমরা নিত্যই প্রত্যক্ষ করি। বরফ থেকে জল, জল থেকে বাষ্প—পদার্থের এই সাধারণ পরিণতি তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। প্রায় সব পদার্থের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যায়। বায়বীয় পদার্থের উপর যদি আরো বেশী তাপমাত্রা প্রয়োগ করা যায় তবে পদার্থের পরমাণুর কক্ষস্থিত ইলেকট্রনগুলিও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। এমন কি, বিশেষ পদার্থের ক্ষেত্রে বিশেষ তাপমাত্রায় সর্ববহিঃস্থ কক্ষের ইলেকট্রনটি পরমাণু থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণ বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ পরমাণু ইলেকট্রন বিচ্যুতির ফলে ধন তড়িৎযুক্ত আয়নে পরিণত হয়। বিভিন্ন তেজ প্রয়োগ করে এই আয়নন প্রক্রিয়া সম্ভব—তবে তাপ প্রয়োগে আয়নন প্রক্রিয়াকে তাপীয় আয়নন বলা হয়। অধ্যাপক সাহা একটি সূত্রের সাহায্যে বিভিন্ন পদার্থে বিভিন্ন তাপমাত্রায় ও চাপে আয়ননের মাত্রা গণনা করেন। কোন পদার্থের আয়নন তেজ (অর্থাৎ কত তাপমাত্রায় পরমাণুটি আয়নিত হবে) জানা থাকলে চাপ ও তাপমাত্রা থেকে কত পরমাণু আয়নিত হবে, অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে তা জানা যায়।

নিচের সারণীতে বিভিন্ন পরম তাপমাত্রায় ও চাপে ক্যালসিয়াম পরমাণু শতকরা কত পরিমাণে আয়নিত হবে, অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে তা গণনা করা হয়েছে।

চাপ পরম তাপমাত্রা	বায়ুমণ্ডলের সমান	বায়ুমণ্ডলের এক শতাংশ	বায়ুমণ্ডলের এক সহস্রাংশ
২০০০°	—	—	১·৪ × ১০—৩
৩০০০°	—	—	১
৪০০০°	—	২·৮	২·৬
৫০০০°	২	২০	৯০
৬০০০°	৮	৬৪	৯৯
৭০০০°	২৯	৯১	১০০
৮০০০°	৪৬	৯৮·৫	”
৯০০০°	৭০	১০০	”
১০০০০°	৮৫	”	”
১১০০০°	৯৩	”	”
১২০০০°	৯৬·৫	”	”
১৩০০০°	৯৮	”	”

এই সারণী ও সূত্র থেকে দেখা যায় যে, তাপমাত্রা বাড়ালে অথবা চাপ কমলে আয়ননের পরিমাণ বাড়ে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পরমাণু থেকে একাধিক ইলেক্ট্রন বিচ্যুৎ হলে যে বহু আয়নিত পরমাণুর সৃষ্টি হয়, সেখানেও আয়নের মাত্রা এই সূত্র প্রয়োগ করে নির্ধারণ করা সম্ভব।

এই তাত্ত্বিক গবেষণার বহুমুখী প্রয়োগ থেকে এর গুরুত্ব জানা যায়। এই সূত্রের প্রথম প্রয়োগ হয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে। সৌরমণ্ডলে রুবিডিয়াম, সিজিয়াম প্রভৃতি মূল পদার্থগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আয়নিত অবস্থায় থাকে। এই তথ্যটি তাপীয় আয়নন বাদের সূত্র

থেকে প্রথম পাওয়া যায়—এই রকম আরও কতকগুলি মূল্যবান তথ্য থেকে সৌরমণ্ডলে পার্থিব ৯২টি মৌলিক পদার্থের কয়েকটির অনুপস্থিতির কারণ নির্ণয় সম্ভব হয়। সৌরকলঙ্কের তাপমাত্রা সূর্যের সাধারণ তাপমাত্রা থেকে কম। তাই সৌরকলঙ্কের বর্ণালী একটু ভিন্ন রকমের হয়। এই পার্থক্যও তাপীয় আয়ননবাদের মূল সূত্র থেকে ব্যাখ্যা করা যায়। সূর্য ছাড়া লালদানব থেকে শ্বেতবামন শ্রেণীর বিভিন্ন নক্ষত্রের পৃষ্ঠ-তাপমাত্রা ৩০০০° থেকে ২০০০০° (পরম) হতে পারে। এই সব নক্ষত্রের বর্ণালীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য—অধ্যাপক সাহার সূত্র থেকে পরোক্ষভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষাগারে অধ্যাপক সাহার সূত্রটি হাতে কলমে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে ডঃ শ্রীবাস্তব একটি বায়ুহীন চুল্লী তৈরি করেন। বিভিন্ন তাপ ও চাপ-এর প্রয়োগে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থ আয়নন প্রক্রিয়ায় কিভাবে তাপীয় আয়ননের সূত্র মেনে চলে, এই যন্ত্রের দ্বারা তার পরীক্ষা সম্ভব হয়। এই বায়ুহীন চুল্লীর সাহায্যে ক্লোরিন, ব্রোমিন প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের ইলেক্ট্রন শোষণ প্রবণতা ও এই সংক্রান্ত তথ্যগুলি পরীক্ষা করা যায়।

সৌরচ্ছটায় বহু আয়নিত লৌহ, নিকেল, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি পরমাণুর অবস্থান ইউরেনিয়াম পরমাণুর মত বিভাজন প্রক্রিয়ায় সম্ভব এবং এই বিভাজন প্রসূত পদার্থগুলি ত্রিধা বা চতুর্ধা বিভক্ত হতে পারে—অধ্যাপক সাহার এই মতবাদ ইউরেনিয়াম পরমাণুর ত্রিধা বিভাজন (Trifission) আবিষ্কৃত হওয়ার বহু পূর্বেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন। এই মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সৌরচ্ছটার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা বিশ্বের বিজ্ঞান সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বর্ণালী বিশ্লেষণের বিভিন্ন পরীক্ষা ও মৌলিক মতবাদের স্রষ্টারূপে অধ্যাপক সাহা পৃথিবীর একজন প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীরূপে সম্মানিত হন।...

জ্যোতির্বিজ্ঞান ছাড়া আয়ন-স্তরের গবেষণায় তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এলাহাবাদে অধ্যাপক থাকাকালীন তাঁর এই গবেষণা আরও উন্নত হয়। তারপর ইন্‌স্টিটিউট্ অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের কয়েকজন ছাত্রের সহযোগিতায় আয়নস্তর সম্বন্ধে তাঁর মতবাদগুলি পরীক্ষা করেন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে এই গবেষণা সাফল্যমণ্ডিত হয় ও অধ্যাপক অ্যাপ্‌ল্‌টন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অভিনন্দন লাভ করে।...

[রচনাটি (৯ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) জ্ঞান ও বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত অধ্যাপক সূর্যেন্দু বিকাশ কর মহাপাত্রের "অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার বৈজ্ঞানিক অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ-বিশেষ]

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার রচনা থেকে

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

প্রায় ১৮ বৎসর পূর্বেকার কথা, আমি তখন প্রথম বিলাত হইতে ফিরিয়াছি। বৈজ্ঞানিক জগতে তখন আমার সামান্য কিছু সুনাম হইয়াছে। ঢাকা শহর নিবাসী (অর্থাৎ আমার স্বদেশবাসী) কোনোও লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল আমি কি বৈজ্ঞানিক কাজ করিয়াছি জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমি প্রথম জীবনের উৎসাহভরে তাঁহাকে আমার তদানীন্তন গবেষণা সম্বন্ধে (অর্থাৎ সূর্য ও নক্ষত্রাদির প্রাকৃতিক অবস্থা যাহা Theory of Ionisation of elements দিয়া সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়) সবিশেষ বর্ণনা দেই। তিনি দুই-এক মিনিট পর পরই বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "এ-আর নূতন কি হইল, এ সমস্তই "ব্যাদে" আছে।" আমি দুই একবার মৃদু আপত্তি করিবার পর বলিলাম, "মহাশয়, এসব তত্ত্ব বেদের কোন অংশে আছে, অনুগ্রহ পূর্বক দেখাইয়া দিবেন কি?" তিনি বলিলেন, "আমি কখনও" "ব্যাদ পড়ি নাই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা নূতন বিজ্ঞানে যাহা করিয়াছ বলিয়া দাবি কর তাহা সমস্তই "ব্যাদে" আছে।" অথচ এই ভদ্রলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় সমম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জাতি ও অপরাপর বিজ্ঞান

সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে। সকল প্রাচীন সভ্য দেশের পণ্ডিতগণই বিশ্বজগতে পৃথিবীর স্থান, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্রাদির গতি, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারূপ কথা বলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান বিজ্ঞান গত তিনশত বৎসরের মধ্যে ইওরোপীয় পণ্ডিতগণের সমবেত গবেষণা, বিচারশক্তি ও অধ্যবসায় প্রসূত। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি, এদেশে অনেকে মনে করেন, ভাস্করাচার্য একাদশ শতাব্দীতে অতি অস্পষ্টভাবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং, তিনি নিউটনের সমতুল্য। অর্থাৎ নিউটন আর নূতন কি করিয়াছেন? কিন্তু এই সমস্ত অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী শ্রেণীর তার্কিকগণ ভুলিয়া যান যে, ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে এমন কথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রকাশ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর ও অপরাপর গ্রহের ভ্রমণ কক্ষ নিরূ-পণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রীক বা আরবী পণ্ডিত কিপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহুপূর্বেই মাধ্যা-কর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন এরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছুই নয়। দুঃখের বিষয় দেশে এইরূপ অপবিজ্ঞান প্রচারকের অভাব নাই, তাঁহারা সত্যের নামে নির্জলা মিথ্যার প্রচার করিতেছেন মাত্র।...

প্রথমে জানা প্রয়োজন, 'বেদ' কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল? বেদে অনেক জ্যোতিষিক ঘটনার উল্লেখ আছে। এই সমস্ত ঘটনার সময় নির্ণয় করা দুঃসাধ্য নয়। অধ্যাপক জেকোবী, শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, বালগঙ্গাধর তিলক, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখ দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতগণ এই সমস্ত জ্যোতিষিক উল্লেখের বিজ্ঞানসম্মত

পর্যালোচনা করিয়া 'বেদের উপরোক্ত অংশের সময় নির্ণয়ে প্রয়াস পাইয়াছেন।' ...এই সমস্ত প্রবন্ধে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বেদোক্ত জ্যোতিষিক ঘটনাগুলির কোনটিকেই খ্রিস্টিয় অব্দের চারি সহস্র বৎসর পূর্বে ফেলা যায় না। অনেকে মনে করেন যে, বাস্তবিক পক্ষে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দ হইতে ৮০০ অব্দের মধ্যে বেদের বিভিন্ন অংশ সংকলিত বা রচিত হইয়াছিল, যেখানে ইহা হইতে প্রাচীনতর ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহা 'শ্রুতি মাত্র'। যেমন বর্তমানে এদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাতে অশ্বিনী নক্ষত্রকে নক্ষত্রপুঞ্জের আদি ধরা হয়। ইহা বর্তমানে শ্রুতিমাত্র, কারণ বাস্তবিক পক্ষে অশ্বিনী নক্ষত্র আদি নক্ষত্র ছিল খ্রিস্টাব্দ ৫০৫ অব্দে, ১৯৩৯ অব্দে নয়। বর্তমান পঞ্জিকা-কারগণ 'মানসিক জড়তা' বশত ১৪৩৪ বৎসর পূর্বের জ্যোতিষিক ঘটনাকে বর্তমানকালীয় বলিয়া প্রচার করিতেছেন। বেদের প্রাচীনতম অংশও অনেক সুবিজ্ঞ লেখকের মতে বাস্তবিক সংকলন কালের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বের ঘটনার শ্রুতিমাত্র বহন করিতেছে। যাহা হউক, বেদের প্রাচীনতম অংশকেও খ্রিস্ট অব্দের ২৫০০ বৎসর পূর্বে ফেলিতে ইওরোপীয় পণ্ডিতগণের বিশেষ আপত্তি নাই।

সুতরাং পৌরাণিক সত্যযুগের কথা, যাহা ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী এবং বর্তমান সময়ের ২১,৬৫,০৪০ বৎসর পূর্বে শেষ হইয়াছিল বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা সম্পূর্ণ অলীক ও ভ্রান্ত।

খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে পৃথিবীর নানাস্থানে অনেক বড় বড় সভ্যতার উৎপত্তি হইয়াছিল। মিশরীয় সভ্যতাকে খ্রিস্টপূর্ব ৪২০০ অব্দ পর্যন্ত টানিয়া আনা যায়। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩ হাজার অব্দে মিশরে পিরামিড ইত্যাদি নির্মিত হইয়াছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ অব্দে ইরাক দেশের সুমেরীয় জাতি সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে আরূঢ় ছিল। সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে প্রাচীন সভ্য জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ব্যাবিলোন নগরী ইরাকের রাজধানীত্ব লাভ করে। নানাবিধ প্রমাণ প্রয়োগে স্থির হইয়াছে যে, মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে যে প্রাগ্বৈদিক্ ভারতীয়

সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাকে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের দুই-এক শতাব্দীর এদিকে বা ওদিকে টানিয়া আনা যায়।

এখন জিজ্ঞাস্য যে, "বৈদিক সভ্যতা এই সময়ে কোন্ দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রাচীন মিশরীয়, সুমেরীয় ও প্রাগ্বৈদিক ভারতীয় সভ্যতার সহিত উহার কোনো আদান প্রদান ছিল কি না?—বৈদিক সভ্যতার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দের মিশরীয় রাজাদের উৎকীর্ণ লিপিতে। এই রাজাগণ আধুনিক মোসাল (Mosul) নগরীর উত্তর পশ্চিম অংশে বাস করিতেন এবং তাঁহারা যেরূপ সম্ভ্রমের সহিত মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে ধারণা হয় যে, নিজেদের সভ্যতাকে উক্ত দুই সভ্যতার সমপর্যায়ভুক্ত মনে করিতেন না। আর একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যদিও প্রাচীন মিশরীয়গণ, ইরানিয়ান্ অর্থাৎ পারস্য দেশবাসী আর্যগণ ও ভারতীয় বৈদিক আর্যগণ—সকলে প্রায় এক ভাষাভাষী ছিলেন, কিন্তু এতাবৎকাল পর্যন্ত তাঁহাদের নিজস্ব কোনো লিপি ছিল বলিয়া কোনো অবিসম্বাদিত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরঞ্চ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরবর্তীকালের তুর্কীদের বা মধ্য এশিয়াবাসীদের মতো তাঁহারা যখন যে-দেশে গিয়াছেন সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন পারস্যের এথিপিনীয় বংশীয় রাজগণ, বিশেষত ডেরিয়াস (দেরায়াবুস্) ও তাঁহার পরবর্তী সম্রাটগণ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে তাঁহাদের অনুশাসনের ভাষা প্রায় বৈদিক ভাষা, কিন্তু লিপি প্রাচীন ব্যাবিলন প্রচলিত কীলক-লিপি এবং সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ সিরিয়া দেশ প্রচলিত Arama-ric লিপি। ১৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরীয়গণ তাঁহাদের অনুশাসনে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ইত্যাদি বৈদিক দেবতার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এখানে ব্যাবিলন প্রচলিত কীলক লিপি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভারতীয় আর্যগণ ৫০০ খ্রিঃ পূর্ব অব্দের পূর্বে কি লিপিতে লিখিতেন এখনও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ২৫০ খ্রিঃ পূঃ অব্দের

অশোক রাজার অনুশাসন সমস্তই ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা, হয়তো এই লিপির উৎপত্তি ইহার অনেক পূর্বেই হইয়াছিল। কি করিয়া এই লিপির উৎপত্তি হইল এখনও তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় নাই।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে ধরিয়া লওয়া বোধহয় অসঙ্গত হইবে না যে, প্রাচীন আর্যগণের কোনো নিজস্ব বিশিষ্ট লিপি ছিল না; তাঁহারা বিজেতা হিসাবে যে-দেশে গিয়াছেন, সেই দেশের লিপিই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব কোনো লিপি (Script) থাকিলে তাঁহারা কখনও বিদেশীয় লিপিতে নিজেদের ভাষা উৎকীর্ণ করিতেন না। ইংরেজ ভারতবর্ষে বা চীনে আসিয়া কি নিজেদের লিপি পরিবর্তন করিয়াছে? মধ্যযুগের আরবগণ অনেক সুসভ্য দেশ নিজেদের অধিকারে আনে, কিন্তু সর্বত্রই অধিবাসীদিগকে আরবী-লিপি গ্রহণে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু মধ্য এশিয়ার তুর্কী বা হূন বর্বরেরা বিজেতা হইয়াও চীনে চীন-লিপি-পারস্যে ফারসী-লিপি এবং রাশিয়াতে cyrillic লিপি গ্রহণ করিয়াছিল, কারণ তাঁহাদের নিজস্ব কোনো লিপি ছিল না।

সুতরাং আশাকরি, সমালোচকগণ স্বীকার করিবেন যে, ঋগ্বেদ সংহিতা খ্রিঃ পূঃ ২৫০০ অব্দ হইতে রচিত হইতে আরম্ভ হয় এবং ইহা যেরূপ সমাজের বা সভ্যতার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে সেই সমাজ ও সভ্যতা হইতে উন্নততর সমাজ ও সভ্যতা পৃথিবীর অন্যান্য অংশে (ঈজিপ্ট ইরাক) এবং সম্ভবত এই ভারতবর্ষেও বর্তমান ছিল। ঋগ্বেদের নদনদীর উল্লেখের পর্যালোচনা করিলে মনে হয় যে বর্তমান পাঞ্জাবের উত্তর পশ্চিমাংশ ও বর্তমান আফগানিস্থানের পূর্বাংশ প্রাচীনতম আর্যগণের বাসভূমি ছিল এবং তাঁহারা প্রায়ই সভ্যতর সিন্ধুনদবাসীদিগকে উৎপীড়ন করিতেন।

ঋগ্বেদ সংহিতায় সমসাময়িক সুমেরীয় বা মিশরীয় সভ্যতার কোনো উল্লেখ আছে কি? এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ

এখনও আবিষ্কার হয় নাই বটে, কিন্তু পরলোকগত লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধে দেখান যে, অথর্ববেদের কতকগুলি দুর্বোধ্য শব্দ ও শ্লোক্, যাহাদের কোনওরূপ সুস্পষ্ট অর্থ করা কখনও সম্ভবপর হয় নাই, সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া যায়—যদি ধরা যায় যে ঐ সমস্ত শব্দ ব্যাবিলন দেশে প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে। যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, অথর্ববেদ ১৫০০-১৬০০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে রচিত হইয়াছিল, তাহা হইলে তিলকের প্রবন্ধ হইতে প্রমাণ হয় যে এই সময়ে ভারত ও ব্যাবিলনের ভিতর যোগাযোগ ছিল। হয়ত ঋগ্বেদের অনেক অনেক দুরূহ অংশেরও এইভাবে মীমাংসা হইতে পারে।...

[উপরের প্রবন্ধটি অধ্যাপক সাহার আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধের নির্বাচিত অংশ বিশেষ। প্রবন্ধটি সেকালের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১৩৫৮ সালের সংখ্যায় চারটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল]

*　　　*　　　*　　　*

মেঘনাদ সাহার নির্বাচিত রচনা

পৃথিবীর আকার ও অবস্থান

...পৃথিবী গোল, এই জ্ঞান অতি পুরাকালে পণ্ডিতদের মধ্যে মান্য হইলেও সাধারণ লোকে ইহা বহুদিন বিশ্বাস করে নাই। কারণ, তাহারা দেখে যে, পৃথিবী চ্যাপ্টা ও অসীম। তাহারা পণ্ডিতদের কথা বিশ্বাস করিবে কেন? যেহেতু সাধারণ লোকের মধ্যে লেখা-পড়া ততটা প্রচলিত ছিল না এবং তাহারা গণিতের তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ ছিল না। আর এক প্রধান কারণ এই যে, পুরোহিত শ্রেণীর লোকে এই তত্ত্ব লোক-সাধারণে প্রচার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কারণ, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবসায়টি মারা যায়। তাঁহারা লোককে বুঝাইতেন যে, পৃথিবী অসীম এবং দেবতারা তাঁহাদেরই দেশে পর্বতাদির উপর বাস করেন। যেমন, প্রাচীন গ্রীকেরা মনে করিতেন, দেবতারা তাঁহাদের দেশের উত্তরস্থ ওলিম্পাস্ পর্বতে বাস করেন এবং সেই স্থানে দেবরাজ জুপিটার অন্য সমস্ত দেবতাদিগকে লইয়া খুব ঘটা করিয়া দরবার করিতেন এবং মানুষের ভাগ্য নির্ণয় ও পাপপুণ্যের বিচার করিতেন। কিন্তু দিবারাত্রি কি করিয়া হইত? তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্যদেবতা "অ্যাপোলো" জুপিটারের আদেশে অশ্ববাহিত রথে চড়িয়া রোজ আকাশে চক্কর দিয়া আসিতেন এবং সন্ধ্যা হইলে শ্রান্তি দূর করিবার জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের শীতল জলে ডুব মারিতেন। যতক্ষণ তিনি আকাশে ঘুরিতেন, ততক্ষণ ছিল দিন, যখন সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকিতেন, ততক্ষণ ছিল রাত্রি। এই দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার ভার ছিল "পুরোহিতদের" উপর। তাঁহারা পূজা-অর্চনা করিলে দেবতা তুষ্ট হইতেন বলিয়া লোকের

বিশ্বাস ছিল। পৃথিবী যদি গোল ও অসীম প্রমাণ হয় এবং ওলিম্পিস্ পর্বত তাহার উপর একটি ছোট পাথরের ঢিপি বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে লোকে আর দেবতাদিগকে মানিবে না এবং দেবতাদের দালাল পুরোহিতদিগকেও মানিবে না। সুতরাং পুরোহিত শ্রেণীর লোকে পৃথিবীর তত্ত্ব সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচার করিতে বড়ই নারাজ ছিলেন। গ্রীকরা মনে করিতেন গ্রীকদেশ ও ভূমধ্যসাগর পৃথিবীর কেন্দ্র এবং আটলান্টিক মহাসাগরের অসীম জলরাশি চতুর্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহারা আমেরিকা, চীন, প্রশান্ত মহাসাগর ইত্যাদির অস্তিত্ব জানিতেন না। প্রাচীন হিন্দুদেরও পৃথিবী সম্বন্ধে তেমন ঠিক ধারণা ছিল না। তাঁহারা ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বলিতেন এবং মনে করিতেন যে, পৃথিবী থালার মত চ্যাপ্টা ও গোল এবং পৃথিবীর ব্যাসের সমান উচ্চ সুমেরু পর্বত উহার কেন্দ্রে অবস্থিত। তাঁহারা আরও মনে করিতেন যে, সুমেরু পর্বতের চারিদিকে সূর্যদেব সপ্তাশ্ববাহিত রথে দিবারাত্রিতে একবার ঘুরিয়া বেড়ান এবং যখন তিনি সুমেরুর উত্তর দিকে যান, তখন দক্ষিণ দিকে সুমেরুর ছায়া পড়িয়া রাত্রি হয়, দক্ষিণ দিকে আসিলে দিন হয়।'...

[রচনাটি অধ্যাপক সাহার "পৃথিবীর আকার ও অবস্থান" শীর্ষক রচনার অংশ বিশেষ]

* * *

পুত্র অজিত সাহাকে লেখা

মেঘনাদ সাহার পত্র

[এক]

London
June 27—1936

স্নেহাস্পদেষু

তোমার গত সপ্তাহের চিঠি পাইলাম। কোপেনহাগেন্ হইতে এখানে ফিরে এসেছে। জার্মান পুস্তকগুলো পেয়েছ কিনা লেখ নাই।

তুমি যদি October-র পর থাকিতে না চাও. আমার সঙ্গেই যাইবে। ১৫ই অক্টোবর নাগাদ আমরা রওনা হইব। ইহা ছাড়া আর কিছু করা এখন সম্ভব নয়। কারণ আমি ১লা জুলাই Queen Mary জাহাজে America যাচ্ছি। আমাকে এই ঠিকানায় চিঠি লিখবে।

C/o Prof. Harlow Shapely
Harvard College Observatory,
Cambridge, Mass, U. S. A.

আমি ২৩শে সেপ্টেম্বর বিলাতে ফিরে আস্‌ব। আশা করি তুমি আর দুইমাস জেনিভাতে থাক্‌তে পারবে। তুমি খুব Homesick হ'য়েছ জেনে আমি খুব উদ্বিগ্ন রহিলাম। কিন্তু এখন আর কি করা যায়? আমি আমেরিকা হইতে গল্পের বই, ইত্যাদি শীঘ্রই পাঠাব। খুব পড়াশুনা কর এবং workshop-র কাজ, camera-তে ফটো তোলা, Gardening ইত্যাদি শেখ। তোমার ছবিগুলো মা'কে পাঠাইলাম। মুরলী ও বুড়ীরও দুখানা চিঠি পাঠালাম। তাহাদিগকে চিঠি লিখবে। আমি ভাল আছি, তোমার কুশল সংবাদ দিবে।

ইতি—
আশীর্বাদক
তোমার পিতা

[দুই]

Harvard College Observatory
Cambridge Massachusetts
July 25, 1936

স্নেহের খোকা,

তোমার ১৫ই জুলাই এর চিঠি পাইয়া সুখী হইলাম। আশা করি আমার Queen Marry হইতে লিখিত কার্ড ও চিঠি ও অন্যান্য চিঠি পাইতেছ। তুমি যে জায়গায় গিয়াছ তাহা বেশ ভাল জেনে সুখী হইলাম। আগামী সপ্তাহে তোমার জন্য আমার ছবি পাঠাব।

এই সপ্তাহে দুখানা বই পাঠালাম। দুখানাই Popular Scientific। Microbe-hunter বইখানি চমত্‌কার লেখা। আগাগোড়া পড়িবে। আশা করি বুঝিতে কোন কষ্ট হবে না। তোমার German পড়া কেমন হচ্ছে লিখিবে। সে সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই।

তোমার চিঠি হইতে মনে হয় তুমি অত্যন্ত homesick হ'য়ে পড়েছ। ইহা খুবই স্বাভাবিক। তবে ছেলেদের সাথে খুব মেলা-মেশা করিবে। এবং খেলাধূলা করিবে। শুধু বই নিয়ে বসে থাকবে না। শুধু পড়াশুনাটাই জীবনকে সার্থক করতে পারে না, লোকের সাথে মেলামেশা করাটাও অত্যন্ত দরকার। যদি একে-বারেই ঐ জায়গা ভাল না লাগে, তাহা হইলে ডাঃ দাসের বাড়ী আসিয়া থাকিও। বাড়ীর চিঠি পেয়েছি। সকলেই ভাল আছে। ইতি

আশীর্বাদক
তোমার পিতা

পত্রদুটি ড. শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত

শিশুবর্ষে গৃহীত পরিকল্পনার

৭৪

গ্রন্থ